একক ৫ ❑ উপন্যাসের শৈলীবিচার

৫.১ উপন্যাসের শৈলীবিচার

৫.২ উপন্যাস শৈলীর সন্ধানে

৫.২.১ বর্গীকরণ (টাইপস অব নভেল)

৫.২.২ প্রসঙ্গ ও সমস্যাতত্ত্ব

৫.২.৩ অবয়বকৌশল

৫.২.৪ ভাষা নিয়ে

৫.৩ উপন্যাসের স্বপ্নভগ্ন : 'চোখের বালি'

৫.৩.১ 'চোখের বালি'র ঔপন্যাসিক জাত

৫.৩.২ গঠনকল্পনা

৫.৩.৩ ভাষাভঙ্গি : প্রাচীন-নবীনের সংঘর্ষ

৫.৩.৪ শব্দজাল : পুরোনো, অচল, নূতন শব্দ

৫.৩.৫ উপমার বিশেষত্ব ও শ্রীহীনতা

৫.৩.৬ ভাষার নাটকীয়তা, বাস্তবধর্মিতা, মনোবিশ্লেষণ প্রয়াস

৫.৩.৭ এপিগ্রাম : ভাষার অন্ত প্রসঙ্গ

৫.৩.৮ 'চোখের বালি'র মূল্য, জনপ্রিয়তা ও ঔপন্যাসিক কণ্ঠস্বর

৫.১ ❑ উপন্যাসের শৈলী

উপন্যাসের মতো বিমিশ্র (কম্পোজিট) সাহিত্যমাধ্যম খুব একটা চোখে পড়ে না। ছোটগল্প, কবিতা, নাটক, চিঠিপত্র, বর্ণনাত্মক গদ্য, জ্ঞানমূলক গদ্য, সব কিছুই উপন্যাসে স্থান করে নিতে পারে। স্থান করে নিতে পারে—ছোটগল্পের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা, কবিতার স্বরূপে কিংবা আবেগঘন উচ্চারণে, নাটকীয় সংলাপে, গদ্যের বিচিত্র ব্যবহারের মধ্যে। ফলে কবিতা, গদ্য, ছোটগল্পের আলোচনায় আমাদের যে স্বচ্ছন্দভাব ছিল, তা এখানে নানা প্রশ্নের শিকড়ে বাধা পায়। তাই শৈলীবিজ্ঞানের একান্ত মনোযোগী বিশ্লেষকও উপন্যাসের শৈলী আলোচনায় বিরত থাকেন। অনেকে ভাষাপথে এর সমাধান খুঁজেছেন। জেন অস্টেনের উপন্যাসে আভিধানিক শব্দগুলো কত বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত, এর উদাহরণমালা একটি বিচ্যুতির অভিধান হাজির করলেও আমরা অতৃপ্ত থাকি।

চরিত্র, সংলাপ, আলোচনা, ভাষা, অবয়ব, প্রসঙ্গ, উপলক্ষ—সব মিলে উপন্যাসের শিল্পজগৎ এক বিশাল আকার ধারণ করে। এর মধ্যে চরিত্রকে অবয়ব অংশ বলব কিনা, এ বিষয়ে সংশয়ী মানুষের সংখ্যা কম নয়। কেননা প্লট এবং চরিত্রের আন্তর সম্পর্কবিচার এখনও অবধি প্রহেলিকার মতো।

প্রশ্নটি একটু সরল করা যাক। তা হল উপন্যাসে আমরা কী দেখতে চাই? কেউ বলেন চরিত্রের জটিলতা, কেউ বলেন প্লটের জটিলতা। আবার ব্যক্তি-সমাজের দ্বন্দ্বরূপে একে কেউ দেখতে চান। উপন্যাসে যা একান্ত থাকা দরকার, তা হল লেখকের জীবনদর্শন। অন্যত্র তা থাকে। কিন্তু উপন্যাসের বিশাল পটচিত্রে এর রূপায়ণই আমাদের লেখক তার শিল্পধারণা সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে।

জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা নিয়েও মতামতের ঝড় রয়েছে। কোনো লেখক জীবনদর্শন বলতে বোঝেন বাস্তবতার চিত্রণ, সমাজের তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণ। এর বিরুদ্ধাচরণের অভাব নেই। আমরা র‍্যালফ ফক্সের মতো স্বীকার করি (অ্যাবাভ অল, নভেল রাইটিং ইজ আ ফিলোজফিক্যাল অকুপেশন)। কিন্তু সেই দর্শন যখন শিল্পরূপ নেয়, তখন তা কীভাবে ঘটে, এই আলোচনায় আমরা উৎসাহী। লেখক কি কোনো ছক (প্যাটার্ন) সাজিয়ে নেন জীবনদর্শনের বিন্যাসের জন্য? নাকি কলমের ডগায় চরিত্রেরা আসে। তারাই গল্প সাজিয়ে উপন্যাসের চেহারা দেয়? উপন্যাসের শরীর নিয়ে লেখক কীভাবে ভাবেন? একজন ভাস্করের মতো তারও কি এই মূর্তি-গঠন নিয়ে নানা চিন্তা কাজ করে? নইলে একজন শিল্পী তো একইভাবে উপন্যাসের শরীর গড়তেন। এই উপন্যাসের সাজবদল বিষয়ের চাপে না অন্য কোনো কারণে, এর উত্তর সন্ধানই আমাদের লক্ষ্য। উপন্যাস লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নেয় চরিত্রদের নিজের দাবিতে—এমন মন্তব্য বিখ্যাত ঔপন্যাসিকরা করলেও আমরা এত সহজ সমাধান ভাবতে পারছি না।

৫.২ ❑ উপন্যাসশৈলীর সন্ধানে

উপন্যাসশৈলী নিয়ে কয়েকটি মানক (প্যারামিটার) আগে স্থির করা প্রয়োজন। এই মানকগুলি সর্বত্রই স্থির থাকবে, এমন বলতে চাওয়া হচ্ছে না। বরং উপন্যাসের শৈলীবিচারে এরা একটা পথনির্দেশ করতে পারে। এই মানকগুলির প্রয়োগ এবং তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা একসময় বাংলা উপন্যাসের আটটি নমুনা নিয়ে দেখানো হয়েছিল।[১] এখনও অবধি সেই আলোচনার কাঠামো পরিবর্তনের কোনো জোরালো কারণ ঘটেনি বলে আমরা সেগুলি পুনরুক্ত করছি।

৫.২.১ বর্গীকরণ (টাইপ্ অব্ নভেল)

যে উপন্যাস বা উপন্যাসাবলির বিচার সমালোচক করবেন, তার বর্গ সবচেয়ে আগে নির্ণয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি প্রবল সমালোচনার পথিক হবেন না, এমন নয়। তবে সংস্কারমুক্তিরও প্রয়োজন আছে। প্রাক্তন সমালোচনায় চরিত্র তেমন গুরুত্ব পায়নি বলে কিংবা চরিত্র-প্লটের সম্পর্ক জটিল বলে মাঝে মাঝে উপন্যাসের বর্গবিচারে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ বা পরিবার থাকলেই তা সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাস হয়ে ওঠে না। লেখক পাঠককে সমাজের কেন্দ্রে না বিশেষ চরিত্রের অন্দরমহলে হাজির করবেন, তার সেই চেষ্টার ওপর উপন্যাসের সামাজিকত্ব বা চরিত্রপ্রাধান্য নির্ভর করে। পদ্মা নদীর মাঝিতে প্রথম দিকে যেমন জেলেসমাজের বিস্তৃত বিবরণ আছে, তেমনি পরের দিকে কুবেরকথাই আমাদের মন কাড়ে। কুবের যদি জেলেসমাজের প্রতীক হয়, তাহলে এটি সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু কুবেরের ব্যক্তিগত তৃপ্তি-অতৃপ্তিবোধ জেলেদের সাধারণ ধর্ম হয়ে

উঠবে কেমন করে? শলোখভের ডন সিরিজ একটি সমাজের অঞ্চলের জীবনকথা হয়ে উঠেছে। পদ্মানদীর মাঝিতে সেই সম্ভাবনা কোথায়? সমালোচক তাই প্রসঙ্গ ও চরিত্রের সূক্ষ্ম বিচার করে শ্রেণি ও ব্যক্তি পারস্পরিক ঔপন্যাসিক গুরুত্ব স্থির করবেন। নইলে সামাজিক সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্যক্তিচরিত্রকে উপেক্ষা করে বর্গীকরণ একটা পণ্ডশ্রমের উদাহরণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কোনো সময় উপন্যাসের যা কিছু ঘটমান, তা লেখকের মানসিক আয়নার প্রতিফলন। তিনি বিশেষ তত্ত্বের উপযোগী আদর্শ ঘটনাকে বেছে নেন। তাই বাইরে তারা ঘটনার প্রতিভাস জাগালেও অন্তরঙ্গে একটি তত্ত্বকে নানাভাবে দেখার ক্রিয়াই তারা সাধন করে। ঔপন্যাসিকের এই বিশেষ তত্ত্বমুখিতা না বুঝলে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ, মানিকের চতুষ্কোণ, সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী পড়ে মনে হতে পারে এগুলি অসংলগ্ন রচনা। এক জায়গায় এদের নাম উচ্চারিত হলেও এই রচনাগুলিও এক জাতের নয়। কিন্তু এরা তত্ত্বমুখ্যতারই বাহন। এদেরকে ব্যাখ্যানমূলক (এক্সপ্লানেটরী) বলা চলে।

৫.২.২ প্রসঙ্গ ও সমস্যাতত্ত্ব

উপন্যাসপ্রসঙ্গ ব্যাপারটি অনেক সমালোচকদের কাছে কাহিনির সারাৎসার বলে অনুমিত হয়েছে। লেখকের অনুসারী হয়ে তাই তারা দুবার কথনে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। প্রসঙ্গ তাই এদের কাছে অনন্ত। আমরা প্রসঙ্গ বলতে অন্য কথা বলতে চাই। প্রসঙ্গ মানে কাহিনি নয়। তা হল জীবনের প্রবাহ থেকে নির্বাচিত কয়েকটি নির্দিষ্ট সমস্যা। এই সমস্যার কূটতা ঔপন্যাসিককে স্পন্দিত করে। তিনি কাহিনির ছকে ঐ সমস্যা তোলেন। সমাধান সেখানে থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। সামাজিক মানুষরূপে, অনুভবের শিল্পীরূপে জীবন-সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা, তাদের বৈচিত্র্যকে ধারণের আনন্দ তিনি পাঠককে সংক্রমিত করতে চান। তিনি জীবন ও জগতের একটি ব্যাখ্যানকর্ম উপহার দিতে চান। সেই ব্যাখ্যান নানাভাবে হতে পারে।

যদি কাহিনি ঐতিহাসিক চরিত্র বা প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়ে ঔপন্যাসিকের জীবনব্যাখ্যান উপস্থিত করে, তাহলে তা ঐতিহাসিক উপন্যাস। মানবীয় প্রেমসম্পর্ক এবং প্রেমহীনতা কোনো উপন্যাসে জটিল সমস্যারূপে চিহ্নিত হতে পারে। আবার অন্য জায়গায় তো সহকারী ঘটনারূপে বা সমস্যার আকারে আসতে পারে। ইতিহাসকে কেউ জীবনব্যাখ্যানের তাগিদে মৌল উপাদান ভাবেন। অন্য দিকে কালের চেতনা ইতিহাসকে অন্যরূপে ফুটিয়ে তোলে।

সামাজিক মানুষের জীবনে কেন্দ্রীয় সমস্যা হল রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, প্রেম এবং ধর্মজড়িত। এদের মুখ্য ভাবলে গৌণ সমস্যার উৎপত্তি হয়। ব্যক্তিমানুষের মানস-দর্পণে এরা কয়েকভাবে ছায়া ফেলে। যেমন বলতে পারি 'ঐতিহ্য' (চলে আসা সমাজব্যবস্থা, সংস্কারের প্রতি আস্থা), 'হিসাব' (প্রাক্তন বর্তমানের ঘটনাফল বিচার করে মানসিক তৃপ্তি-অতৃপ্তিবোধ), 'ব্যাখ্যা' (ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তিকল্পনা বা আদর্শের ব্যাখ্যানকর্ম)। ঔপন্যাসিক জানেন তিনি কেন্দ্রীয় সমস্যার একটি কাহিনিমূলক শিল্পরূপ সৃষ্টি করতে চান। সেই সৃষ্টিকর্মে লেখকমনের ব্যক্তিগত প্রবণা অনুযায়ী গৌণ সমস্যা তাই মুখ্য হয়ে ওঠে। আমাদের প্রস্তাবিত গৌণ সমস্যাগুলি কেন্দ্রীয় সমস্যাভূমি থেকে জাত বলে পাঠক কেন্দ্রীয় সমস্যারও স্বাদ পান। সহজ কথায়, কেন্দ্রীয় সমস্যার ধারণাটি হল সামাজিক বিজ্ঞান-নির্ভর আর গৌণ সমস্যাগুলি উপন্যাসের শিল্প ধারণাজাত।

৫.২.৩ অবয়ব কৌশল

উপন্যাসের অবয়ব সম্পর্কে প্লট ধারণা বহুদিন ধরে চলে আসছে। প্লট বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট অনুভবমূলক এবং শৈল্পিক প্রতিক্রিয়া লাভের জন্য উপন্যাস ঘটনার গঠনভঙ্গি। সংজ্ঞাটি সহজ দেখালেও সহজ নয়। কেননা ঘটনা সংঘটিত হয় চরিত্রের মানসিক, শারীরিক, বাচিক এবং অ-বাচিক ক্রিয়ার দ্বারা। এর মধ্যে চরিত্র এভাবে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। হেনরী জেমস তাই বলেছিলেন, ঘটনার বিচার-নিষ্পত্তি ছাড়া চরিত্রকে কী বলব? আর ঘটনা চরিত্রের ব্যাখ্যান ছাড়া ঘটনা আর কী?

প্লট বলতে একটি সাহিত্যকর্মের ঘটনাপ্রবাহের সারসংক্ষেপ নয়। যখন সারসংক্ষেপের মধ্যে কেন এবং কী করে প্রশ্ন দুটি সক্রিয় থাকে, তখনই সত্যিকারের প্লটধারণা তৈরি হয়। যেমন একজন ঔপন্যাসিক অনেকসময়েই চরম মুহূর্ত (ক্লাইম্যাক্স) আগে সাজান। বাকিটা আসে অতীত বোঝাতে। আবার কেউ উপসংহারকে প্রথমে নিয়ে আসেন। কোনো কোনো ঔপন্যাসিক অঘটনের জয়যাত্রা করে মূল ঘটনায় পৌঁছোন। আবার মনস্তাত্ত্বিক ও চেতনা-প্রবাহধর্মী উপন্যাসে সাধারণ কেন এবং কী করের পরম্পরা রক্ষা করা হয় না। এখানে এর পরে এই, এমনটি নূতন করে সাজাতে হয়।

এবারে সাধারণ প্লটধারণার একটু আভাস দেওয়া যাক। প্লট এগিয়ে চলে। পাঠকের মনে ভবিষ্য ঘটনা সম্পর্কে একটা প্রত্যাশাবোধ জন্মায়। একটা অজানা উৎকণ্ঠায় আমরা শিহরিত হই। বিশেষ করে যেসব চরিত্র ইতিমধ্যে আমাদের সহানুভূতি কেড়েছে, তাদের জন্য উৎকণ্ঠা জাগে। একে বলতে পারি সন্দেহজনিত উৎকণ্ঠা (সাসপেন্স)। আবার যা আমাদের প্রত্যাশাভঙ্গ ঘটায় তা হল চমক (সারপ্রাইজ) প্লটের প্রাণ হল এই উৎকণ্ঠা এবং চমকের ওঠা-পড়া। পড়া ঘটনা এবং জানা চরিত্র যখন আমাদের প্রত্যাশার বাইরে চলে যায়, তখনই চমক সবচেয়ে সক্রিয়তা দেখায়। অপ্রত্যাশিতের মানসিক আঘাত সবসময় পাঠক সহ্য করেন না। এর উত্তর কাহিনিতে মেলে না। এর উত্তরসন্ধানে সামাজিক প্রেক্ষিত, লেখকের ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্ব এবং কালের অভিঘাতের কাছে পৌঁছতে হয়। যেমন, চোখের বালিতে বিনোদিনীর কাশীযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় বিষবৃক্ষেও সমাজমনকে অস্বীকার করতে পারেননি।

কাহিনির শুরু, বিকাশ এবং পরিণামকে কেউ কেউ গুস্তাভ ফ্রেতাগের মতো একটি পিরামিড আকারে কল্পনা করেন। যেমন,

ক = কাহিনির উদ্ভব
খ = কাহিনির বিকাশ
গ = কাহিনির পরিণতি

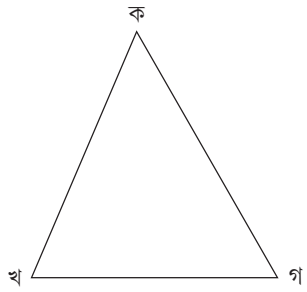

রেখাচিত্র : ১ ফ্রেতাগের প্লটধারণা

আবার এটিকে বৃত্ত বলার পক্ষপাতী আলোচকও আছে। তাঁদের কাছে প্লট এইরকম :

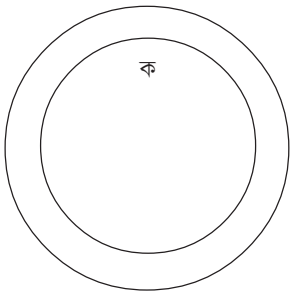

ক = মূল কাহিনী
খ = উপকাহিনী
রেখচিত্র ২ : প্লটের ধারণা

মূল কাহিনিবৃত্তের চারপাশে এক বা তার বেশি উপকাহিনি লেখকের ধারণা, চরিত্রের বিশেষত্ব চরিত্রের সম্পর্ক বোঝাতে আসে। কখনও আবার উপকাহিনি হয়ে দাঁড়ায় মূল কাহিনিবৃত্তের বিপরীত দর্শনজাত। অর্থাৎ লেখক একটা জীবনবৈপরীত্য বোঝাতে উপকাহিনি আনেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই উপকাহিনি মূল কাহিনির পুষ্টিই ঘটায়। এমন তো হতে পারে যে উপকাহিনি মূলের চেয়ে লেখকের দৃষ্টিকে বেশি কাড়ল? তখনই হয় বিপর্যয়। উপকাহিনি সেখানে আকারে-প্রকারে মূল বৃত্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। পরগাছার মতো মূল কাহিনিবৃক্ষকে নীরক্ত, নীরস করে সে বেঁচে থাকে।

কাহিনি চরিত্রের দাবিতে এগোয়—এমন অবান্তর ধারণা আমরা স্বীকার করি না। বরং আমাদের কল্পনা হল, লেখক গোটা কাহিনিকে একটা চিন্তাবৃক্ষরূপে ভাবেন। নিজের জীবনব্যাখ্যানকে সুষ্ঠু রূপ দিতে গেলে এছাড়া 'নাস্ত্যেবগতিরন্যথা'। এর শিকড় লেখকমনে থাকলেও বাইরে এটি কয়েকটি পর্ব বা খণ্ডে, খণ্ড আবার পরিচ্ছেদে বিভক্ত থাকে। লেখকমনের ভাবনার সবচেয়ে বড়ো অংশ হল খণ্ড (পার্ট)। আর তার অংশ হল পরিচ্ছেদ (চ্যাপটার)। লেখকমন পরিচ্ছেদ থেকে খণ্ডে, আবার বিপরীতক্রমে যাওয়া-আসা করে। পরিচ্ছেদের আবার বিভাগ দেখি—অনুচ্ছেদ (প্যারাগ্রাফ)। অনুচ্ছেদ শুধু অন্বয়তত্ত্বের নয়, ঔপন্যাসিক শিল্পরূপেরও একটি প্রকাশ। অনুচ্ছেদকে এযাবৎ আমরা শেষতম বিভাগ মনে করেছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখি, পরিচ্ছেদের মধ্যস্থলে কিছুটা স্থান ভাগ করে একটা উপ-পরিচ্ছেদ (সাব-চ্যাপটার) আনা হয়েছে। অনেক সময় পরিচ্ছেদ পালটালো না। অথচ লেখক কাহিনীতে নূতন চরিত্র, ঘটনা, বা ঘটনার অন্য ব্যাখ্যান সংযোজন করলেন। একে তর্কের খাতিরে কেউ কেউ বলেন মুদ্রণ প্রয়োজনে আগত। আমাদের কাছে এই উপ-পরিচ্ছেদ এতটা সহজ সিদ্ধান্ত নয়। কেননা এই নূতন বিভাগটি ঘটে নানা কারণে—কখনও সময়ের বদল, কখনও উপকাহিনী, কখনও একই ঘটনার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া বা ভিন্ন ঘটনার ভিন্ন ঘটনাস্থল বোঝাতে। সঞ্জননী-রূপান্তরী ব্যাকরণের বৃক্ষচিত্ররূপে এটিকে এভাবে দেখতে পারি :

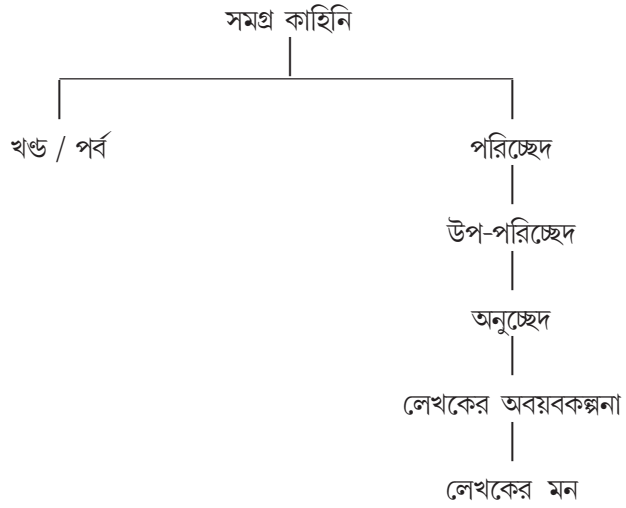

রেখাচিত্র ৪ : আমাদের অবয়বধারণা

লেখকের ধারণা পর্ব থেকে পরিচ্ছেদ, উপ-পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদে যায়। আবার সবকিছু পর্বে ফিরে আসে। এভাবে পর্ব থেকে অনুচ্ছেদে অবিরাম যাওয়া-আসা ঘটে। এই পর্ব-পরিচ্ছেদ মিলে যার অধীনতা স্বীকার করে, তা হল লেখকের অবয়ব-পরিকল্পনা। লেখকের মনে হল গভীর স্তর (ডীপ লেভেল), আর অনুচ্ছেদ থেকে পর্ব হল উপরিস্তর (সারফেস লেভেল)।

পড়ুয়া পাঠক এমন একটি রেখচিত্রে আপত্তি তুলতে পারেন। কেননা সব উপন্যাস তো এমনভাবে লেখা হয় না। খণ্ডহীন, পরিচ্ছেদহীন উপন্যাসও তো দেখি। যেমন মানিকের চতুষ্কোণে এই ঘটনা ঘটেছে। এই অভিনব উপন্যাস-অবয়ব আসলে লেখকের অবয়বধারণার বহিরঙ্গ প্রকাশ, উপকাহিনি এখানে বর্জিত। চারটি মেয়েকে ঘিরে নায়কের যে পরীক্ষানিরীক্ষা, তারই ফল এই উপন্যাস। এখানে সবটাই লেখকের চেতনাপ্রবাহধর্মী ব্যাখ্যান অনুযায়ী উপন্যাসটি নবশিল্পধারণ করেছে।

কখনও আবার খণ্ডেও নবীনতা আছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। এখানে জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস বলে চারটি পর্ব আছে। অথচ জাগরীর মতো তা একেক মানুষের আত্মকথন নয়। কাহিনির কথক একজন, সে হল শ্রীবিলাস। শচীশের ডায়েরি, দামিনীর কথাবার্তা (যা পরে শ্রীবিলাস জেনেছে) এখানে অনুকথক। একটি চরিত্রের পক্ষে সবগুলি ঘটনা জানা বা বাকিদের হৃদয় খোঁড়া সম্ভব ছিল না। চারটি অংশ চরিত্রনামে এলেও মুখ্য কথা এদের কোনো একজনের নয় অথবা এগুলি এদের জবানীতে আসেনি। ঘরে-বাইরেতে যেমন চরিত্রগুলি আত্মকথন করেছে, এখানে তেমনটি করা হয় নি। অথচ খণ্ডগুলির আপাত নামদানে একটা আত্মকথনের বিভ্রম তৈরি হয়েছে।

উপন্যাসের সূচনা ও সমাপ্তির কোনো ছাঁদ আছে কিনা, এ নিয়ে আমরা ভাবিনি। অথচ এ দুটিই উপন্যাসের অবয়বের উল্লেখ্য অঙ্গ। কেননা সূচনা কারোর ধীর লয়ে, কেউ আবার দ্রুত একটি সুর সঞ্চার

করেন। প্রথম ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে কাহিনির জট খোলে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাহিনির দ্রুত সূচনাভঙ্গি পাঠককে মুহূর্তে কাহিনির চমকে টেনে নিয়ে যায়। সূচনায় কখনও দেখি বর্ণনার ভাষা, কখনও নাটকীয় সংলাপ, কখনও জ্ঞানমূলক বিবরণধর্মী গদ্য, কখনও একটি তীক্ষ্ণ রহস্যের সঞ্চারসম্ভাবক ভাষা। এখানে লেখকের উপন্যাসের কথা শুরুর কৌশল ধরা পড়ে।

তেমনি উপসংহারও মনোযোগ কাড়ে। প্রচলিত প্লটধারণার বিমোচন (ক্যাথারসিস) বা অবরোহ-পর্ব সবসময় উপসংহারে মেলে না। লেখক একটি সমস্যা চরিত্র-বিষয়-ঘটনাক্রমে সাজাতে সাজাতে বিপন্ন হন, তখন হঠাৎ জটিলতার জাল ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে মুক্ত করেন। আবার মূল চরিত্রকে নানা অপসারণ কৌশলে কেন্দ্রভূমি থেকে সরিয়ে ঘটনাভার লাঘব করেন। কখনও এভাবে মৃত্যু আসে, মৃত্যুর সম্ভাবনা জাগে অথবা চরিত্ররা দূরের যাত্রী হয়। মৃত্যুরও নানা রঙ দেখি, কখনও তা চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণাম, কখনও বীভৎস রসের। উপন্যাসের সমাপ্তি সূচনার মতো দ্রুত বা ধীর লয়ে ঘটতে পারে। অথবা সংকটের চরম মুহূর্তে পৌঁছে উপসংহার আসতে পারে (যেমন, চার অধ্যায়)। ঔপন্যাসিক সবসময় পাঠককে প্রত্যাশিত সমাধানে পৌঁছে দেবেন, এমন নাও হতে পারে। কেননা, এমন হতে পারে যে (১) প্রত্যাশিত সমাধান তাঁর জানা নেই, (২) ঐ সমাধান জানানো পাঠকের বুদ্ধির প্রতি অনাস্থা জানানোর সামিল, (৩) সমাধানে আসবেন কিনা এ বিষয়ে তার মনে সংশয় আছে।

সূচনা ও উপসংহার তাই প্রসঙ্গ ও অবয়ববিচারে দরকারী ভূমিকা পালন করে। জীবনের একটি ভাষ্যকর্মের কথারম্ভ ও কথাসাঙ্গ কীভাবে লেখক করে, সেটা জানা অবয়বধারণারই বিষয়।

উপন্যাস-অবয়বে বর্ণনামূলক, নাটকীয় সংলাপ ছাড়াও গান, কবিতা, লোককাহিনি, কবিতাংশ, চিঠিপত্র, নীতিমূলক গল্প স্থান পেয়ে থাকে। এগুলির কাহিনিগত প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হবে। এরা অনেক সময়েই চরিত্র-মানসিকতার পরিচয় জানায়। আবার একজন কবি বা গায়ককে নিয়ে লেখা কাহিনিতে চূর্ণ কবিতা, গান আসা স্বাভাবিক। তেমনি লোকজীবনের উৎসব, বিশ্বাস, চরিত্র বোঝাতে লোকগীতি, কাহিনি কিংবা ছড়াগান আসতে পারে। এমনকি ধাঁধাও থাকতে পারে। এ যেমন চরিত্র বা কাহিনির চরিত্রপ্রসঙ্গ বোঝানোর জন্য, তেমনি লেখকের উপন্যাসে একটা ভূমিকায় ব্যবহৃত হতে পারে। যে কথা সরাসরি জানানো যায় না, তাকে চিঠিতে প্রকাশ করা উপন্যাসে একটা সাধারণ কৌশল। আবার দূরের মানুষের কাছে কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়া কীভাবে পড়েছে কিংবা চরিত্র তার হৃদয়দুয়ার কীভাবে খুলে ধরেছে, তা উপন্যাসে চিঠি ব্যবহারের কারণ হতে পারে। বঙ্কিম আবার চিঠিকে বিবেকের দায়িত্ব পালন করিয়েছেন। এইসব চিঠিপত্রের ভাষা উপন্যাসের বহতা ভাষা থেকে আলাদা হয়। এদের ঔপন্যাসিক গুরুত্ব অবয়বধারণায় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

এবার আসা যাক কালের কথায়। উপন্যাসে যে ঘটমান কাল ব্যবহার করা হয়, তা হল আপাত (অ্যাপারেন্ট)। আবার সেই আপাত কাল ছাড়িয়ে চরিত্র-ঘটনা যখন অতীতে প্রবেশ করে এই কালকে সমৃদ্ধ করে, তা হল প্রকৃত (রীয়াল)। এই আপাত-প্রকৃতকালের বিন্যাস লেখক অবিরত করেন এমন নয়। কিন্তু এই কালচেতনাই উপন্যাসের অবয়বে নূতন বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করে। যেমন, পশ্চাৎ-উদ্ভাবন (ফ্ল্যাশব্যাক), আত্মকথনে দুই কালের মিশ্রণ (আপাত ও প্রকৃত)। কখনও কখনও পর্ব-পরিচ্ছেদও এই দুই কালে বিভক্ত হয়ে উপন্যাসের প্রসঙ্গকে নবীন ধরনে জানায়। এর মধ্যে চরিত্রের পরিচয়, মনস্তত্ত্ব থাকলেও অবয়বে এদের স্বাতন্ত্র্য লেখক

দেখান। কখনও আপাত, কখনও প্রকৃত এভাবে কালের বুনোটে পরিচ্ছেদ বোনেন। এই কালের বুনোট দেখা প্রয়োজন।

৫.২.৪ ভাষা নিয়ে

আমরা উপন্যাসের শৈলীর মধ্যে ভাষা-ভিন্ন ধারণার কথা আগে আলোচনা করে নিয়েছি। এবার উপন্যাসের ভাষা-বিচার আলোচনা করা যাক। সমস্যা, চরিত্র, প্রসঙ্গ, বর্ণনা, বাস্তবতা, সংলাপ—এইসব উপন্যাসভাষার অঙ্গ। ভাষার সার্থকতায় যেমন অসাধারণ উপন্যাস-প্রতিমা গড়ে ওঠে, তেমনি ভাষার বিফলতায় মহৎ বিষয়ও কালের গর্বে লোপ পায়। এছাড়া অনেক উপন্যাস লেখককে আমরা যে ভাষাভঙ্গিহীন মনে করেছি (যেমন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), তারও পুনর্বিচার প্রয়োজন। লেখকের শব্দ বাছাই, বাক্যের সরল/বাঁকা গড়ন, বর্ণনাকৌশল, ভাষাজ্ঞান—সবই এখানে আলোচ্য হতে পারে।

১. প্রত্যেক লেখক উপলক্ষ ও মানসিকতা অনুযায়ী ভাষার নির্বাচন করেন। এক্ষেত্রে উপলক্ষের চাপ প্রধান বিবেচ্য। একটি উপভাষা বা প্রান্তিক অঞ্চল-কথা লিখতে চাই প্রয়োজনীয় উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাজ্ঞান। এই জ্ঞানও আবার পরিমিতিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। নইলে উপভাষার দখল দেখাতে গিয়ে লেখক এক প্রাণহীন উপভাষাকর্ম রচনা করতে পারেন। আবার উপভাষা অঞ্চলের চরিত্র আদর্শ চলিতে বাক্য বলে চলেছে। এমন হলে কাহিনিতে প্রত্যাশিত অঞ্চলবোধ সঞ্চারিত হয় না।

২. বাংলা ভাষার দুটি লেখার ধরন লেখকের সামনে থাকে—ক. সাধু, খ. চলিত গদ্য। সাধু গদ্য ও চলিত গদ্যের ভেদরেখা অনেকের কাছে স্পষ্ট হলেও আমাদের কাছে তা শুধুমাত্র ব্যাকরণ-বৈশিষ্ট্যের ভেদ নয়। সাধু গদ্যের আড়ালে চলিতের সুর অনেক সময় বেজে ওঠে। আবার অনেকের চলিত গদ্যের মধ্যে সাধুর ব্যঞ্জনা লক্ষ করি। উপন্যাসে এই দ্বিচারণা সংলাপের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট হয়। বর্ণনাত্মক সাধুভাষায় বর্ণনার পর সংলাপ এসেছে চলিতে। ঔপন্যাসিক কি এখানে বর্ণনার জন্য মৃত ভাষা এবং সংলাপের জন্য জীবন্ত ভাষা ব্যবহার করতে চান? সাধু গদ্যের চালচলনে যে একটা আড়ষ্ট, মন্থরতা জন্মায়, সংলাপে তা আরও কৃত্রিম হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে গদ্যের এই দ্বিচারণা দেখতে পাই।

৩. চলিত গদ্যে যাঁরা উপন্যাস লিখছেন, তারাও একই চলিতের সাধনা করেন না। কারও চলিত বর্ণনাধর্মী, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। আবার অন্য ঔপন্যাসিক চলিতকে শাণিত, পরোক্ষ বাক্যমালায় সাজিয়ে তোলেন। এ ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের শব্দ তাকে সাহায্য করে, তা নিয়ে যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন আছে। মানিক অসাধারণ উইটে ভাষার রূপনির্মাণ করেছেন তৎসম শব্দের সাহায্যে। এখানে শব্দ নয়, বাক্য গড়নের দ্বারা এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার ক্ষমতা এই উইটের মূলে। তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ কিন্তু এই উইটপ্রধান ভাষার আশ্রয় বেশি নেননি। কেননা তাঁদের কাছে জীবনের স্থির, নিস্তরঙ্গ প্রবাহ সত্য ছিল। এদের মধ্যে একটা প্রচল উপন্যাস-ভাষার প্রতি সংসক্তিবোধও ছিল। মানিক, জগদীশ গুপ্ত কিন্তু প্রচল উপন্যাস-ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেননি। এক নাগরিক মনোবৃত্তি (যা ব্যঙ্গপ্রবণ এবং বিশ্লেষক) তাঁদেরকে অন্য ভাষারূপ গ্রহণে বাধ্য করেছে জীবনকে বিশ্লেষণ করে বাঁচার দুঃখবোধ তাঁদের ভাষার শাণিত রূপের মূলে। অন্যদিকে পাঠক সম্পর্কে দুপক্ষেরই লক্ষ্য আলাদা।

তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ যখন প্রচল উপন্যাসভাষা অবলম্বন করে বেশি পাঠক পেতে চান, তখন মানিক তাঁর ভাষাগুণে মুষ্টিমেয় সাহিত্যরসিকের তৃপ্তি জোগান।

উপলক্ষ এখানে সামান্য প্রতিবাদ জানায়। কেননা মানিকেরও পাঠক কম নয়। পাঠক কম না হলেও মানিককে তাঁর শিল্পরূপে বুঝেছেন, এমন মানুষের সংখ্যা এখনও কম। নইলে তাঁর শিল্পরূপ প্রকরণ নিয়ে আমরা মোটা দাগ টেনে যাচ্ছি কেন? যুগের বক্রভাষণ এবং সকলের আড়চোখে সকলকে দেখার ভঙ্গি মানিকের উপন্যাসরূপকে জটিল করে তুলেছে।

উপন্যাসে ভাষার আরেকটি লক্ষণীয় দিক হল—গ্রাম্য, ইতর, দেশি এবং নিষিদ্ধ শব্দের ব্যবহার। উপন্যাসে এমন অনেক চরিত্র আসে যারা শুচিবায়ুগ্রস্ততাকে ছিন্ন করেছে। শিল্পে পবিত্র এবং অপবিত্র ভাষার ভেদ এভাবে লোপ পেয়েছে। শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন যে-কোনো শব্দ সাগ্রহে লেখক বরণ করেছেন।

উপন্যাসে দ্বিতীয় ভাষার (সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ) প্রয়োগ একটি সাধারণ ঘটনা হলেও এটি আমাদের প্রাক্তন সমালোচনায় স্থান পায়নি। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষার কথা বলতে গেলে যে বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার উদাহরণ বাংলা উপন্যাসে অজস্র। কখনও চরিত্ররা দ্বিতীয় ভাষায় দক্ষতা দেখিয়েছে (আড়ালে আছে লেখকের দ্বিতীয় ভাষাজ্ঞান)। কখনও আবার মিশ্রভাষার (মিক্সড ল্যাংগুয়েজ) বনেদ গড়ে উঠেছে। ইংরেজের বলা বাংলা কিংবা বাঙালির হিন্দিতে এমন মিশ্র ভাষারূপ দেখি। ইংরেজের বাংলা উচ্চারণে 'ট' বর্ণের মাত্রাবৃদ্ধি বাংলা নাটক-উপন্যাসে একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার 'মুসলমানী বাংলা' বলতে আরবি ফারসি উর্দু শব্দের ছিটেফোঁটা এসেছে। এভাবে বাঙালি লেখক ইংরেজি, হিন্দি, মুসলমানি বাংলার এক ঔপন্যাসিক ভাষাছাঁদ গড়েছেন। কোনো কোনো সময় হাস্যরস বা চরিত্রের জাতি-পরিচয় এই ভাষাকৌশল ফোটানো যায়।

নূতন শব্দ নির্মাণ, পুরোনো শব্দে নূতন মাত্রাদান, সাদৃশ্য-শব্দ নির্মাণ (অ্যানালজি ফর্মেশন) কবিতার মতো উপন্যাসেও বারবার ঘটেছে এবং ঘটছে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মতো একালের তিন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক—তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। দেশি ও তদ্ভব শব্দকে সমাসবদ্ধ করা মানিকের বিশেষ কৃতিত্ব।

উপমার বিচিত্র প্রয়োগ কবিতার মতো উপন্যাসেরও সম্পদ। এক্ষেত্রে উপমা এবং বিশেষণশব্দ লেখকের উপমাচয়নে সার্থকতা-ব্যর্থতা জানায়। আবার কালোপযোগী আধুনিক মানস পুরোনো উপমায় অতৃপ্তি জানিয়ে নূতন উপমালোক তৈরি করেছে। উপমার পৌরাণিক যুগ এভাবে দূরে সরে গিয়ে আধুনিক বাতাবরণ খুঁজে ফিরেছে।

বাক্যবন্ধ একেক ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে একেকরকম। কারোর ঝোঁক সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ বাক্যে। কেউ আবার যৌগিক এবং জটিল বাক্যমালায় বক্তব্য প্রকাশ করেন। তবে সরল বাক্যে উপন্যাস লেখা একান্ত জটিল ও যৌগিক বাক্যগঠনের মূলে ক্রিয়া করে। জটিল বাক্য মানে দূরান্বয় নয় কমলকুমার মজুমদারের মতো। কেননা সংপ্রেষণের ক্ষমতাই ঔপন্যাসিক বাক্যের একমাত্র লক্ষ্য। দীর্ঘ বাক্যমালা (নানা যতিচিহ্নের বাঁধনে বাঁধা) অমিল নয়। লেখক এখানে বলেই যাচ্ছেন। পাঠক নিজের অর্থবোধের বিপত্তি দেখতে পান। তবে সৌভাগ্য যে এরা একটি চৌদ্দ পঙ্‌ক্তিক বাক্য নয়, অনেক বাক্যের সমাহার-বিন্যাস। শুধু চোখের দেখায় এইসব বাক্য একটা ভয়ের আবহাওয়া তৈরি করে।

সম্বোধন বাক্য আসে নানা কারণে। লেখক নিজেই অনুপ্রবেশ করে পাঠককে বোঝানোর দায়িত্ব নেন। কেন তিনি উপকাহিনি শেষ করছেন, বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করছেন, অন্য কাহিনিতে প্রবেশ করছেন—এসব তথ্য সম্বোধনবাক্যে পরিবেশিত হয়। ঔপন্যাসিকের একটা সর্বজ্ঞ (ওমনিসিয়েন্ট) মনের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। পাঠককে ডেকে চরিত্র, তাদের কর্মলক্ষের মূল্যায়ন করা উপন্যাসের আদি যুগের এবং বর্তমানের সর্বজনীন (প্যানাক্রনিক) লক্ষণ। এ জাতীয় মন্তব্য এবং অবয়বের ভিন্নতা জাগায়। প্রাথমিক যুগে লেখক আড়ালে আবডালে বলে পুতুলখেলা পছন্দ করতেন না বলে এরকম করতেন। এখনও তা বহমান কেন? আশ্চর্যের বিষয় এই কৌশলটি একেবারে বাতিল হয়ে যায়নি। আসলে লেখক চরিত্র-ঘটনা-বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকের আড়ালে অস্বস্তিতে থাকেন। তাই এগিয়ে এসে অন্তরঙ্গতা তৈরি করতে চান। এতে আন্তরিকতা থাকলেও পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা এবং বোধগম্যতার সীমা সম্পর্কে একটু তাচ্ছিল্য লুকিয়ে থাকে।

বাক্যে বক্রতার পরিমাণ, সাধু-চলিতের দ্বন্দ্ব, উপভাষাবোধ, দ্বিতীয় ভাষার ব্যবহার, নবশব্দনির্মাণ, বাক্যের সম্বোধনরীতি শেষে আরেকটি সমাজ-ভাষা (সোসিওলেক্ট) ধারণার পরিচয় নিলে পাঠক এই উপন্যাসের শৈলীর শেষে পৌঁছতে পারেন। এটি হল সম্বোধনসূচক সর্বনামের বিচিত্র প্রয়োগ। এইসব সর্বনাম (তুই-তুমি-আপনি) সামাজিক স্তরভেদে, ঘনিষ্ঠতার মাত্রায় অবিরত নানা রূপ নেয়। আদরে তাচ্ছিল্যে নামের বিকৃত উচ্চারণ দুর্লভ নয়। সামাজিক ব্যাকরণে যেমন 'হরি' 'হরে'তে পরিণত হয়। তুই-তুমি-আপনি সম্বোধনে সর্বনামের তিনটি ব্যাকরণবৈশিষ্ট্যই নেই, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয়বহ। অজানা মানুষ পরিচয়ের প্রথম পর্বে 'আপনি' সম্বোধনে আপ্যায়িত বা দূরায়িত (ডিসট্যান্ট) হলেও পরে তুমি/তুই দ্বারা ঘনিষ্ঠ হয়ে যেতে পারে। যেমন কাজের জায়গায় বা পরিচয় গভীর হলে। নিম্নজাতীয় মানুষের প্রতি উঁচুজাতের মানুষের 'তুই' ডাক পালটে যায় সামাজিক সম্মানে বা টাকার জোরে প্রথম জন সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠলে। আবার পরিচিত মানুষজনের কাজে গুণী মানুষও প্রাপ্য সম্মান পান না। তাই তার সামাজিক স্তর, আত্মীয়তাসম্বন্ধ একটু নীচু মাত্রার 'তুই' যোগ করে। সম্বোধনের বৈচিত্র্যকে আমরা রেখাচিত্রে দেখাচ্ছি :

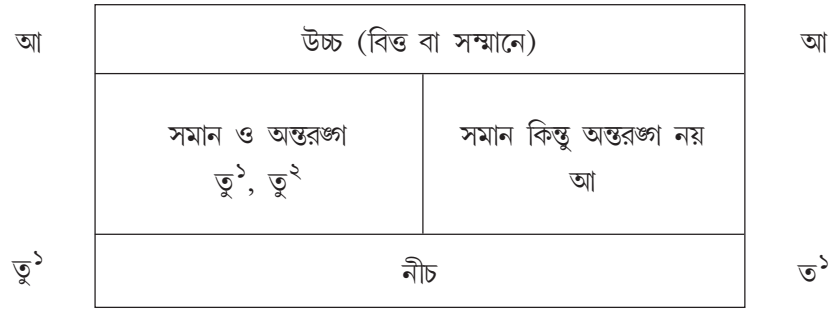

রেখাচিত্র ঃ তুই-তুমি-আপনির সম্বোধনবৈচিত্র্য

এই রেখাচিত্রে আ=আপনি

তু[১]=তুই

তু[২]=তুমি

চরিত্রগুলির সামাজিক মর্যাদা, পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে ঔপন্যাসিক এই সম্বোধনবৈচিত্র্যকে মেনে চলেন। আবার এদের রদবদলে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, তা তাঁকে খেয়াল রাখতে হয়। যুগ পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে নীচু তলার মানুষরা 'তুমি' দ্বারা সম্বোধিত হতে চায়। এতে আবার বড়োমানুষরা অস্বস্তিতে পড়েন। সমাজের এই স্তরবদল এবং সম্মান নিয়ে বিতর্ক ঔপন্যাসিককে তাঁর চরিত্রে নির্দিষ্ট মাত্রা জোগায়।

উপন্যাসের শৈলী, এইসব অবয়ব-ভাষা প্রয়োগের বৈচিত্র্য লক্ষ করলে আমরা একজন ঔপন্যাসিকের শৈলীবদলের ইতিহাস জানতে পারি। কখনও এই কাঠামোর বাইরে কেউ যাবেন না, এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না। কেননা শব্দশাস্ত্রের মতো উপন্যাসের শৈলী অনন্ত সম্ভভাবনা ফুটিয়ে তোলে। অনন্ত সম্ভাবনা বললে ব্যাখ্যানের দায়িত্ব কমে যায়। অথচ বাংলায় উপন্যাস শৈলী নিয়ে প্রথম আলোচনার সূত্রে একটা ভাবনা কাঠামোর (থট প্রসেস) উপস্থাপনে সুধী পাঠকেরা নিশ্চয়ই অভিযোগের তর্জনী তুলবেন না।

এবারে উপন্যাস শৈলী বিশ্লেষণের একটি প্রয়োগকর্ম পাঠকের সামনে হাজির হচ্ছে। রচনাটি হল রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩)। মানুষের আঁতের কথা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ধারায় প্রতিবাদকারী তৃতীয় বিষবৃক্ষের ব্যর্থতাবহ এই উপন্যাস সমালোচকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা এই রচনাটির শিল্পগুণ বিশেষত শৈলীরূপবিশ্লেষণে তৎপর হচ্ছি। এই আলোচনায় শেষ অংশ চোখের বালির শৈলীবিচার। এই বিচারে সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট মানুষরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন পূর্বাহ্ণেই। ব্যাপক পাঠকের কাছে এটি কেমন প্রতিক্রিয়া জাগায়, তা জানার কৌতূহল রইল।

৫.৩ ❑ উপন্যাসের স্বপ্নভঙ্গ : 'চোখের বালি'

দুটো উপন্যাস লেখার পর ছোটোগল্প আর অসামান্য কবিতার ফুল ফুটিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকালেন আধুনিক সামাজিক সমস্যার দিকে। আগের দুটো উপন্যাসে ইতিহাস-কল্পনা-রোমান্সের ভাঙা আয়নায় মানুষের জীবনকে দেখেছেন। কিন্তু সে দেখা অপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের আলাদা প্রতিরূপের পথরোধ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'চোখের বালি' বেরোয় নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে (১৩০৮-০৯ বঙ্গাব্দ)। বিষয়ক্ষেত্রে সমস্যা এখানেও বাল্যবিধবার প্রেমচেতনা। অথচ 'বিষবৃক্ষ'-এর কুন্দনন্দিনী বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী এখানে ফিরে এল না। এল বিনোদিনী, যে 'বড় সুন্দরী', 'মেমের কাছে পড়াশুনা' করা, দুজন পুরুষ এবং একজন নারীর জীবনে অশান্তির ঝড় তুলল। বাঙালি পাঠকের মনও অশান্ত হল বক্তব্যের নবীনতায়, পরিচিত উপন্যাস-কল্পনা আঘাত পেল।

সমালোচকরা উপন্যাসে আধুনিকতার সূচনা লক্ষ করলেন। বঙ্কিম-উপন্যাসে সামাজিক-পারিবারিক বাতাবরণ, রোমান্সের ঘনঘটাকে এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ চোখ ফেরালেন ব্যক্তিমনের অন্দরমহলে। সেখানে অবিরত প্রবৃত্তির ওঠা-পড়া, কী যে সে চায়, নিজেই জানে না। বিনোদিনীর এই অবোধ্যতাই আধুনিক মানুষের লক্ষণ। ঔপন্যাসিক সহজ অপসারণ-কৌশলে[১] বিনোদিনীকে সরালেন না কিংবা রমেশচন্দ্রের মতো পুনর্বিবাহে[২] সুখী করলেন না। চেতন-অবচেতন, সামাজিক সংস্কার ও নারীর স্বাভাবিক কামনার দ্বন্দ্ব বিনোদের জীবনকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। যে-পরিণতিতে সাধারণ গল্প-ভোলা পাঠক অমিলে কষ্ট পান আর প্রবীণ সমালোচকরা রোমান্সের আলো[৩] জ্বলে উঠতে দেখেন। 'পশুশালার দরজা' খোলা হল। চরিত্ররা কলকাতা-বারাসত-কাশী-এলাহাবাদের বিরাট

পরিধিতে মুক্তি পেল। অথচ এই স্থানিক বিস্তার রোমান্সের অঘটনের জন্য নয়, চরিত্রের আত্মগোপন বা অবচেতনের প্রকাশক্ষেত্র হয়ে উঠল।

বঙ্কিমে মাতৃচরিত্র অবহেলিত। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে চলে আসা বাঙালির মাতৃচেতনাকেও রবীন্দ্রনাথ এখানে স্থান দিলেন। মা রাজলক্ষ্মী কিংবা মাতৃসমা অন্নপূর্ণা এলেন। মহেন্দ্র 'মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত', তার 'ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল'। বিহারীকে দুর্বল করে আঁকা হয়েছে। কারণ সে মহেন্দ্রের প্রতিস্পর্ধী চরিত্র নয়, তার সম্পূরক মাত্র (স্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোট)। আশা কুন্দ বা ভ্রমরের মতোই অপরিপূর্ণা। প্রকৃতপক্ষে কাহিনির মৌল চরিত্র বিনোদিনী; ঈর্ষা-সংসারকামনা-ভালবাসার পাত্রের অভাবে অতৃপ্তি সব কিছু মিলিয়ে ব্যক্তিত্বময়ী। একালে নগেন্দ্রনাথের মতো পুরুষের অভাব থাকলেও মহেন্দ্রের মতো প্রেমভিখারী ব্যক্তিত্বহীন ধনীপুত্রের অভাব ছিল না। বিপরীতে বিহারী ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারে না। অনাথ আশ্রম ও বসন্তের পালন করে সে সাংসারিক সমস্যাকে দূরে রাখে। উনিশ শতকের পোষ্যপুত্র এইসব পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা, নারীর মহিমা, অবৈধ প্রেম, সমাজে তার স্থান রবীন্দ্রনাথকে নূতন উপন্যাস লিখতে উৎসাহিত করেছিল। তবু মনে আঁকাবাঁকা টানটোন, চরিত্রের দোলাচলতা বঙ্কিমী ভাবাদর্শের সীমার মধ্যে দাঁড়িয়েই তিনি দেখালেন। এখানেই 'চোখের বালি'র প্রগতি; পরিচিত উপন্যাসের স্বপ্নভঙ্গের সূচনা হল।

৫.৪.১ 'চোখের বালি'র ঔপন্যাসিক জাত

উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের পালাবদল ঘটাল। এই পালাবদলের সূত্রে এর সাহিত্যিক জাত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাস্তববাদী বলতে চান একদল, কেউ বা এক ধাপ এগিয়ে 'মনস্তাত্ত্বিক'। শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উপন্যাস-বিচারে এই জাত-নিরূপণ একটি দরকারি কাজ। আমরা পূর্ব সমালোচনার মধ্যে যুক্তি অনুসন্ধান করতে চাই। প্রথমে 'মনস্তাত্ত্বিক' এই লেবেল নিয়ে আলোচনা করা যাক। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে নয়। মূল্যবোধের ভিত আলগা না হলে নিজেদের অবচেতন ফ্রয়েডীয় বা নাস্তিবাদের নিরর্থকতায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। ১৯০৯-এ চেখভের ইংরেজি অনুবাদ, ফ্রয়েড-ইয়ুংয়ের মনোবিজ্ঞান ব্যাখ্যা, ১৯১০-এ বাস্তবরূপবাদ (ইমপ্রেশনিস্টক) পদ্ধতির ছবির প্রদর্শনী, ১৯১২-তে ডস্টয়েভস্কির গার্নেটকৃত ভাষান্তর, প্রুস্ত-রিচার্ডসন-জয়েসের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসরচনার আবহ তৈরি করেছিল।[৪] সবগুলিই একই কাললগ্ন, ভাবনার নবীনতাই এদের মূলে।

বিশ শতকের প্রথম দশকে চিত্তভূমির প্রাচীন স্থৈর্য একটু-একটু করে নষ্ট হচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এর পর পুরনো বিশ্বাসের শিকড় ওপড়াল। 'চোখের বালি'তে যে মনস্তত্ত্ব আছে, তা বঙ্কিমী নয়। কিন্তু ঘটনা বা প্লটের মোহকে রবীন্দ্রনাথ জয় করতে পারেননি। পুরো মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে ঘটনার ভারের বিরুদ্ধতা লক্ষ করি। সেখানে বাস্তবতা 'ফর্মাল রিয়ালিজম'-এর গণ্ডি ভেঙে 'ইনার রিয়ালিজম' গড়ে তোলে। এর জন্য আমাদের 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছে। 'চোখের বালি'তে মানুষের মন আঁকার শুরু ঘটনার ফ্রেমে, 'চতুরঙ্গ'-এ ঐ ফ্রেমটিও সরিয়ে নিলেন। মনের কথা থাকলেই মনস্তাত্ত্বিক হয় না। জীবন-অন্বেষা ঘটনার ভারমুক্ত হয়ে ভাবনার নির্যাস যেখানে রাখে, সেখানেই উপন্যাস 'মনস্তাত্ত্বিক' আখ্যা পেতে পারে।

এর চেয়ে 'বাস্তববাদী' সংজ্ঞাটি গ্রহণীয়। যদিও এখানে বাস্তববাদ বলতে বলা হচ্ছে 'দা ন্যারেটিভ মেথড হোয়ারবাই দা নভেল এমবডিস সারকামস্টেনসিয়াল ভিউ অব্ লাইফ' বা ফর্মাল রিয়ালিজম। এর সঙ্গে দার্শনিক বাস্তবতাবোধের প্রভেদ আছে। দার্শনিক বাস্তবতাবাদে সমালোচনাত্মক প্রথাবিরোধী, সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিমনের বিশেষ অনুভূতি শব্দার্থের সঙ্গে বাস্তবতার যোগ গড়ে তোলে। 'চোখের বালি'র সময়ে সমাজে ব্যক্তির আলাদা মূল্য অনেকটা মেনে নেওয়া হয়েছে। গোষ্ঠী নয়, ব্যক্তিচেতনা বড়ো হয়ে উঠেছে। ফলে অবৈধ প্রেম, নারীর ব্যক্তিসত্তা, গৃহত্যাগ থাকলেও এই রচনাটি 'বিষবৃক্ষ'-এর প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত মনে বিষবৃক্ষের পরিণতি সমালোচিত হয়ে প্রতিবাদমুখর হল 'চোখের বালি'তে। নারী আলাদা মর্যাদা, পুরুষ-শাসিত সমাজে তাদের প্রেমপাত্রের অভাবে অসহায়তা তিনি দেখালেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী ভাষাভঙ্গি, কাহিনিবয়ন না ছেড়ে সংস্কৃত উপমা-অলংকার-মণ্ডিত ধূসর ভাষার মধ্যে নূতন বক্তব্য আনলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জোরে। উপন্যাসটির মধ্যে প্রথা সনাতন সংস্কার চুরমার, বিনোদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মাঝখানে 'নিবাতনিকম্পমিবপ্রদীপম্'।

প্রশ্ন ওঠে, বঙ্কিমের রচনাতেও তো বাস্তবতা ছিল, কিন্তু ব্যক্তিচেতনার 'এই দৃঢ় ধাতুর মূর্তি' পেলাম না কেন? এর উত্তর খানিকটা মেলে রবীন্দ্রনাথ কৃত 'চোখের বালি'র ভূমিকায়। বাকিটা হল এরকম :

ক. ব্যক্তিকে গুরুতর সাহিত্যবিষয়রূপে সমাজের স্বীকৃতি দান; খ. পাঠকের বিশ্বাস ও কর্মপ্রবাহকে বিশ্বাস্য করে উপন্যাস দেখতে চাওয়া।[৬] তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-শিবনাথ শাস্ত্রী-রমেশচন্দ্র দত্ত-শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে বাস্তবতা এনেছেন। কিন্তু সমাজ তখনও ব্যক্তিমহিমাকে স্বীকার করেনি কিংবা পাঠক নিজের জীবনকে উপন্যাস-উপযোগী মনে করত না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের উপন্যাসে এটা সত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু 'চোখের বালি'র রচনাকালে সমাজ ও পাঠক দুইয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। দুটো কারণ মিলিয়ে বাস্তবতা প্রখর হল, বিনোদিনী আবির্ভূত হল। বাকি চরিত্রগুলি, প্লট, পরিবেশচিত্রণ একটি দায়িত্ব পালন করেছে—নারীর স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদারক্ষার সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বের রূপায়ণ। জীবনচিত্রণের যথার্থতা থাকলে বাস্তববাদী বলতে পারি না, তা প্রকৃতিবাদী হয়ে ওঠে। অথচ বাস্তব সমস্যার কেন্দ্রে পরিবর্তমান সমাজের মধ্যে, মানুষের স্বাধিকারকামনাকে ইতিহাস-কল্পনা-রোমান্সের রঙে আঁকা যায় না, তাকে 'উগ্র মদ্যসম রৌদ্র' তেজে প্রকাশ করতে হয়। 'চোখের বালি' এখানেই বাস্তববাদী উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

গঠনকল্পনা

উপন্যাসশৈলী বলতে ভাষা নয়, গঠনকেও বোঝায়। এমনকি ভাষা-বিজ্ঞান নির্ভর শৈলীবিজ্ঞানেও যে 'ইন্টার-সেন্টেস গ্রামার'[৭]-এর কথা বলা হয়েছে, তা গঠনেরই পরোক্ষ স্বীকৃতি। 'গঠন' মানে পরিচ্ছেদ প্রবাহের সংক্ষেপণ নয়, তাদের অন্তর্নিহিত ঐক্যের বা অনৈক্যের চেহারাটা স্পষ্ট করে তোলা। ঔপন্যাসিক সমগ্র কাহিনিকে একটা চিন্তাবৃক্ষরূপে ভাবেন, খণ্ড (পর্ব) পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ বা উপপরিচ্ছেদ হল তার ডালপালা। এই বৃক্ষটি বিভিন্ন আকারের হতে পারে, ত্রিকোণাকৃতি কিংবা বৃত্তাকার। সমালোচক বঙ্কিমের উপন্যাস-দেহকে পিরামিডাকার কল্পনা করেছেন। যেখানে শেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শে 'হৃদয়াবেগ ও ঘটনাধারা আরম্ভ থেকে ক্লাইম্যাক্সে উপরে উঠছে, ক্লাইম্যাক্স থেকে সমাপ্তিতে নেমে আসছে।'[৮] আবার ফকিরমোহন সেনাপতির 'ছ-মাণ আট গুণ্ঠ' (১৮৮৯

সালে রচিত প্রথম উপন্যাস। যার অর্থ উনিশ বিঘা দুই কাঠা) উপন্যাসে ; উলটো (∩) গঠন দেখি। সেখানে ঘটনা (মূল) আরোহী, মাঝে কয়েকটি পরিচ্ছেদ উপকাহিনি, পরে আবার ঘটনা নেমে এসেছে। এখানে ঘটনা ক্লাইম্যাক্সে আরোহণ করেই ত্রিভুজের মতো নামেনি, মাঝে অলগ্ন একটি উপকাহিনী আছে।[৯]

বঙ্কিম-উপন্যাসে নাটকের দৃশ্যমত স্থানিক নির্দিষ্টতা আছে। যদিও এই 'স্থানীয় ঐক্য'[৯] ইউনিটি অব্ প্লেস কিংবা 'কালিক ঐক্য' ইউনিটি অব্ টাইম সাহায্যকারীরূপে এসেছে। বঙ্কিমে সমান্তরাল ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে

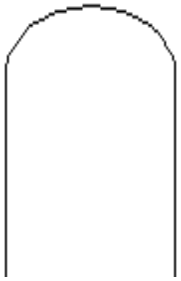

১নং রেখাচিত্র

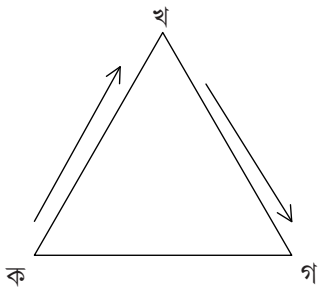

২নং রেখাচিত্র

বৈপরীত্যবোধ কাজ করছে। অতীত উদ্ভাসন-রীতি, ভবিষ্যকথন, ছদ্ম পরিচয়ের কৌতূহল, চরিত্রের অনুপস্থিতি (দীর্ঘকালীন) তাঁর গঠনশিল্পের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য।[১০]

রবীন্দ্রনাথে বঙ্কিমী উপন্যাসগঠনরীতির সাক্ষাৎ পাই। প্রথমে দুজনের মিল আলোচনা করে অমিল দেখানো যেতে পারে। 'চোখের বালি'তে ঘটনাস্থল মূলত কলকাতা বা বারাসাত শহরতলি হলেও প্রয়োজনে চরিত্ররা কাশী-এলাহাবাদ গিয়েছে। ফলে স্থানিক সীমার বিস্তার ঘটেছে। মাঝে মাঝে কাশী-কলকাতা একই পরিচ্ছেদে গ্রথিত (২৩ পরি.)। পঞ্চান্নটি পরিচ্ছেদের গঠনের যে পরিকল্পনা, তার বিশালতা আমাদের চোখ এড়ায় না। অতীত উদ্ভাসনরীতি স্বল্প। কখনও 'আয়রনি' দুটো পরিচ্ছেদে একত্র (যেমন ২৫-২৬ পরিচ্ছেদে আশার কাশীযাত্রার আয়োজন, যাত্রা, রাজলক্ষ্মীর অনুরোধে বিনোদের গৃহশয্যা)। চরিত্রের দীর্ঘ অনুপস্থিতি এখানেও আছে—৭ম পরিচ্ছেদে অন্নপূর্ণা কাশী গেছে; ২২ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে কাহিনিতে ফিরিয়ে আনে, ২৩-এ তাই ঘটনাস্থল কাশী। ২৫, ২৭, ৩০ পরিচ্ছেদে তাকে কাশীতে দেখা গেলেও ৩৫ পরিচ্ছেদে আবার সে মূল ঘটনাভূমিতে হাজির। ভবিষ্যকথন (জ্যোতিষী, সন্ন্যাসী বা দৈববাণী) এখানে নেই। কিন্তু ভিক্টোরীয় সাহিত্যাদর্শে কয়েকটি চিঠির ব্যবহার আছে। বঙ্কিম উপন্যাসে চিঠি একটি গুরুতর উপাদান। মনস্তত্ত্ব বোঝাতে চিঠিগুলি এলেও এগুলি উপন্যাসের ত্রুটির দিক। অলৌকিকতা একেবারেই নেই। কিন্তু সম্পর্ক জোড়ার জন্য কিছু চরিত্র এসেছে। যেমন বসন্ত, অন্নপূর্ণা যাকে কেন্দ্র করে বিহারী-বিনোদ অন্যান্যদের সম্পর্ক জুড়েছে।

পরিচ্ছেদগুলির পরিকল্পনাটি এবার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথম পরিচ্ছেদে মূল চরিত্রগুলির পরিচয় আছে। কালসীমা তিন বছর। রাজলক্ষ্মী-অন্নপূর্ণার দ্বন্দ্ব, বিনোদিনীর সাধব্যজীবনের কথা অল্প পরিসরে বর্ণিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কিশোরী আশালতার কথা। তৃতীয়তে আশাকে নিয়ে মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর সংঘাত। সপ্তম পরিচ্ছেদে ঘটনাস্থল পালটাল, মুখ্য চরিত্রের সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের যোগাযোগ দেখাতে গিয়ে। দশমে সংসারের বেহাল অবস্থায় বিনোদিনী এল, আশা হীনমন্যতায় ভুগল। উপন্যাসের নামকরণ ঘটল—দুজনের 'চোখের বালি'

পাতানোয়। এগারো থেকে পনেরো পর্যন্ত পরিচ্ছেদে বিনোদিনী-মহেন্দ্রের অনুরাগ, বিহারী আড়ালে পড়ে যায়। সতেরো পরিচ্ছেদে ঘটনা দমদমের বাগানে চড়িভাতি, এখানে মহেন্দ্র-বিনোদের সম্পর্কে বিহারীর অনুপ্রবেশ। আশা সরলা ভ্রমরের মতো সংসারের কাজে অনভিজ্ঞা, মহেন্দ্র পৌরুষহীন। কাজেই বিনোদিনীর মহেন্দ্র-জয়ে কোনো বাধা পড়েনি। কিন্তু বিনোদিনী বিহারীর চোখে সমব্যথা দেখেছে, বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। এরপর চৌত্রিশ পরিচ্ছেদ অবধি মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনী কামনায় মগ্ন। আশা-মহেন্দ্রের সম্পর্কে বিস্ফোরিত একটি আপাত 'ক্লাইম্যাক্স' এল পঁয়ত্রিশ পরিচ্ছেদে যেখানে বিহারী বিনোদকে ফিরিয়ে দিল। বিনোদিনী এবার রিক্ত। প্রেমৈকপাত্রের অভাবে উনচল্লিশ-একচল্লিশ পর্যন্ত 'বসুধালিঙ্গন' জীবনযাপন। সাতচল্লিশে অপসৃত চরিত্র অন্নপূর্ণা ফিরে আসে; আশা সান্ত্বনা পায়। আবার এর মধ্যে মহেন্দ্র-বিনোদের উন্মত্ত জীবনযাপন, বিনোদিনীর ক্লান্তি জমে। পঁয়ত্রিশ পরিচ্ছেদে বিনোদিনীর আত্ম-আবিষ্কার, একান্ন পরিচ্ছেদে 'তাহার হৃদয়কে রক্তে ভাসিয়া' দেয়। বিনোদিনী কয়েকবার গৃহত্যাগ করেছে, কখনও সঙ্গীহীন কখনও সঙ্গী নিয়ে। 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ যেমন 'ক্লাইম্যাক্স' এখানে বহির্ঘটনা তা নয়। তাই সতেরো, পঁয়ত্রিশ মিলে যে হৃদয়জ্বালার সূচনা, তার অনুপম বিশ্লেষণ ঘটল একান্ন পরিচ্ছেদে। তিপান্ন নাগাদ সব চরিত্রেরই ভুল ভাঙার পালা, একটা নিম্নগতির শুরু। চুয়ান্ন সবচেয়ে ছোটো পরিচ্ছেদ। কাহিনিভূমি থেকে মহেন্দ্রের মাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়ে সরিয়ে ফেলা হল। বালির অনাথ আশ্রমের কাজে মহেন্দ্র সহকারী হতে চাইল শেষ পরিচ্ছেদে (৫৫ পরি.)। বিনোদ অন্নপূর্ণার সহযাত্রী হয়। বিস্ময়করভাবে মহেন্দ্র বিনোদকে প্রণাম করে। মহেন্দ্র-আশার জীবন নিষ্কণ্টক হলেও সেখানে বিনোদিনীর মূর্তি মুছে যায় না।

লক্ষ করার মতো, পঞ্চান্নটি পরিচ্ছেদের সব কটিকে আমরা গঠন আলোচনায় ব্যবহার করিনি। কেননা প্রেমবোধের জন্ম, বিকারগ্রস্ত কামনা, তা থেকে সহজে মুক্তিলাভ, এগুলি রবীন্দ্রনাথ অনুপুঙ্খভাবে দেখিয়েছেন। এই বিশদতা (ডিটেলিং) অন্যভাবে লেখকের গঠনের অংশ। আমরা দীর্ঘ পরিচ্ছেদবহুল বিশাল আখ্যান থেকে বাঁক নেওয়া বা ঝলসে ওঠা কয়েকটি গুরুতর পরিচ্ছেদের গঠনের ছাঁদ দেখলাম। ঐ 'টার্নিং পয়েন্ট'গুলো ঘটনার উপর নির্ভরশীল। যদিও মনের বিচিত্র গতির সূক্ষ্মতর আলোচনা ঘটনার অ-নির্ভর নয়। আমরা রবীন্দ্র-বক্তব্য নিয়ে প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে ভেবেছি। গঠন কিন্তু বক্তব্য নয়, বক্তব্যস্থাপনের পরিকল্পনা। সেদিক থেকে দেখলে একান্ন পরিচ্ছেদে বিনোদিনীর আত্ম-আবিষ্কারই চূড়ান্ত শীর্ষবিন্দু, যদিও পঁয়ত্রিশে একটি উন্নতি-রেখা পাচ্ছি। প্রথমদিকে তাই রয়েছে (১-৭ পর্যন্ত) পরিচয়-পর্ব, একান্ন পর্যন্ত হৃদয়াবেগ-প্রবৃত্তির অদৃশ্য পাকে মানবজীবনের আন্দোলন। আর বাকি চারটি (বিশেষত উপসংহার) চিন্তাবৃক্ষের ডালপালাকে সংযত করে গোছানোর পালা। যে মহৎ বিনষ্টির শোক পাঠকমনে জেগেছিল, তাকে কুঠারাঘাত করে শান্তিবারি ঢালা হল অন্তিমে। বিধবা প্রেমের সমস্যায় বঙ্কিম বিষপাত্র তুলে দিয়েছেন, রমেশচন্দ্র সংসারের অমৃতকুম্ভবারি দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক চাপ এবং শিল্পসিদ্ধির লড়াইয়ে বিনোদিনীকে সংসারবিষ দিয়ে কাশীতে শান্তিযাত্রা করালেন।

গঠন সম্পর্কে শেষের কথা হল, রেখাচিত্র ১-এ বর্ণিত 'ক্লাইম্যাক্স' (সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ) এসেছে ত্রিশ পরিচ্ছেদে, তারপর আরও কুড়িটি পরিচ্ছেদ চলেছে নিচের ঢালে। আর এখানে পঁয়ত্রিশ আপাত ক্লাইম্যাক্স হলেও প্রকৃত ক্লাইম্যাক্স এল একান্নতে। ফলে সমবাহু ত্রিভুজের পরিকল্পনা খারিজ। বাকি চারটি পরিচ্ছেদ

লেখকের সমাপ্তির অধৈর্য, শিল্পরীতির সংকট প্রতিপন্ন করেছে। তাই এর গঠনে বঙ্কিমী-প্রভাব যেমন সক্রিয়, তেমনি অক্রিয়। গঠনের চক্রান্তের চেয়ে মানসিকতার নিপুণ বিশ্লেষণই রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত ছিল—যদিও সামগ্রিকভাবে বঙ্কিমের উপন্যাস গঠনের ছাঁদ 'চোখের বালি'তে মান্য করা হয়েছে। লেখকের বঙ্কিম-বিরোধী প্রতিপাদ্য, মনোবিশ্লেষণের আগ্রহ একটা ফারাক এনেছে। মুশকিল-আসান চরিত্র নেইই প্রায়। নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তি-মূল্য, মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনচর্যা আঁকার আগ্রহ অবৈধ প্রেমকে আপাত প্রতিষ্ঠাদান 'চোখের বালি'র 'ফর্মাল রিয়ালিজম'-কে পৃথক করেছে। দার্শনিক বাস্তববাদের আলোচনা মনস্তাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার বস্তু। উপন্যাসের তন্ময়ভাবে বহির্গঠন নিয়ে ভাবনা শেষ। বহির্গঠনের বিন্যাসের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক দ্রোহবুদ্ধি অলক্ষ নয়। তিনি তাই বঙ্কিমী উপন্যাসের গঠনছাঁদ বাতিল করলেন না। ঐ সীমাবদ্ধতার মধ্যে আপন জীবনদর্শনের নবীনতা ছড়িয়ে দিলেন।

৫.৩.৩ ভাষাভঙ্গি : প্রাচীন নবীনের সংঘর্ষ

গঠনে যেমন চলতি রীতিকে মান্য করার ভাব, তেমনই ভাষার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নবজাত দ্রোহবুদ্ধি কীভাবে পরিবর্তন এনেছে, তা দেখা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃতজগৎ, বঙ্কিমী ভাষার প্রভাবমুক্তি বা স্বীকার অনিবার্য আলোচ্য বিষয়। ভাষাকে যাঁরা শৈলীর একমাত্র বলে ভাবেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ সাংগঠনিক শৈলীবিজ্ঞানীদের পার্থক্য আছে। উপন্যাসের বহির্গঠন ঔপন্যাসিকের শিল্পকলার নির্মাণ-স্বরূপ স্পষ্ট করে। আবার ভাষা হল মনের বিশেষত্বের সেই প্রকাশ যা বলার কথাকে সুষ্ঠু করে কিংবা এলোমেলো করে। গঠন যদি হয় মনের বাইরের ফটক, তাহলে অন্দরমহলের প্রকাশরূপ হল ভাষা। খণ্ড (পর্ব)-পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ-উপপরিচ্ছেদ আসলে উপরিতল, ভাষা হল নিম্নতল (ইনফ্রাস্ট্রাকচার)। অনুচ্ছেদের গঠন হল বাক্য-পরম্পরা সূত্রে। আবার বাক্যের শেষ বিভাজন হল শব্দ। আমরা ভাষাবিজ্ঞানের উৎসাহী প্রায়োগিক হলেও ধ্বনিবৈজ্ঞানিক স্তর অবধি যেতে চাই না। কেননা বিশ্লেষণের আনন্দে ধ্বনির বৈচিত্র্য দেখা বেশ একটা বিশেষজ্ঞভাব আনলেও তা সাহিত্য আস্বাদনের পরিপন্থী। ভাষার রহস্য, লেখকের নব নির্মাণের আনন্দ, প্রচলিতের আনুগত্য (কনফর্মিটি) কিংবা সরে আসার (ডিভায়েন্স) সাহিত্যিক বিশেষত্বটুকু ধরলেই 'চোখের বালি'র নবপাঠ হতে পারে। শব্দ-অর্থের সহযোগিতা, বাক্যের স্বচ্ছন্দতা একেকজনের রচনায় একেকরকম। আত্ম-প্রকাশে ভাষার এই রকমফেরের পেছনে রচয়িতার শিক্ষাদীক্ষা, পরিবেশ, অগ্রজের প্রভাব এবং সবচেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে স্রষ্টামন। সৃষ্টির রহস্য যেমন উপন্যাসের গঠনে, তেমনি ভাষাশৈলীতেও ব্যাখ্যাত হতে পারে। আগে থেকেই পুরোনো আলোচনা হাঁটকানো কিংবা চরিত্র-বক্তব্যের ভালো-লাগায় মন হারালে সর্বনাশ—নিজের এবং পাঠকেরও। দূরদৃষ্টি এবং ক্ষীণদৃষ্টি কোনোটাই কাম্য নয়। রচনার গঠন ও ভাষাকে তন্ময়ভাবে দেখলে স্বাভাবিক দৃষ্টি সমালোচনায় আসতে বাধ্য। যাক, অবিনয়ী কথা এড়িয়ে 'চোখের বালি'র শব্দজালের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

৫.৩.৪ শব্দজাল : পুরোনো, অচল, নূতন শব্দ

'চোখের বালি'র শব্দজাল ভেদ করতে গিয়ে কতকগুলি শ্রেণিবিভাগ করা ভালো। সবসময় শব্দই ধরা পড়েনি—শব্দ নিয়ে গঠিত বাক্যাংশও দ্বিতীয় স্তরে আসে। প্রথমে শব্দের নব অর্থের প্রয়োগ (১) বিশেষণ-সমাসবদ্ধ পদ (২) কথ্য-ইতর শব্দ (৩) বাক্যাংশের নীরসতা (৪) এবং (৫) অচল শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

(১) কারুকার্য : প্রচলিত আভিধানিক অর্থ শিল্পনৈপুণ্য, নক্‌শা। এখানে বিনোদিনীর শিল্পকর্মের প্রমাণ পাই। শুধুমাত্র সূচীশিল্পের ক্ষেত্রে। কাজেই এখানে প্রচলিত শব্দের সংকুচিত নব অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে।

স্তম্ভিত : বাংলায় প্রচলিত অর্থ অবাক, বিস্মিত (স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চল); রূপক-অতিশয়োক্তি অর্থ প্রধান। কিন্তু 'চোখের বালি'তে এটি আদি অর্থে গৃহীত : 'স্তম্ভের ন্যায় উঁচু-উঁচু গাছের সারি।'

কুলিখিত : বাংলায় নেই। অর্থ দুটি : ১. অপরিচ্ছন্ন হাতের লেখা ২. অপরিচ্ছন্ন ভাবজড়িত। শব্দটি নূতন এবং 'তুচ্ছ পত্রে'র বিশেষণ।

অজস্র (অশ্রুজল) : এখানে বিশেষণটি অগণনীয় নির্দেশক। বাংলায় 'অসংখ্য' অর্থে ব্যবহৃত। 'অঝোর' শব্দের মূল সংস্কৃত রূপপ্রয়োগ একটু শ্রুতিকটু।

দৈহতাপতপ্ত : 'চিঠি'র বিশেষণ। এখানে সংক্ষেপণের জন্য সমাসবদ্ধতা আনা হয়েছে।

পরমস্নেহময় : সাধারণভাবে ব্যক্তির আগে ব্যবহৃত। এখানে ধৈর্যের মতো নির্বস্তক বিশেষ্যের বিশেষণ।

ঘন : 'নিশ্বাসের' বিশেষণ। প্রচলিত বিণ হল 'দীর্ঘ'। মনে হয় ইংরেজি 'ডীপ' বা 'হেভি'-র সাদৃশ্যে এই সংস্কৃত শব্দের বিচিত্র প্রয়োগ।

অনুগ্রহপালিত : এই সমাসবদ্ধ পদটিও নূতন। অনুগ্রহ + পালন দুটি ভাবকে একত্র করার চেষ্টা।

সহারবান্ : 'সাহায্যকারী' অর্থে। 'সহায়' 'মতুপ' প্রত্যয় (< বতুপ) যোগে নব আকার ধারণ করেছে।

ব্যস্ততাবেগবান : এখানে জনপথের ব্যস্ততা, গতি একত্রে বোঝানো হয়েছে।

দিনান্তরম্য : সন্ধ্যাকালীন সৌন্দর্য অর্থে তৎসম শব্দসমষ্টির নব প্রয়োগ।

ভোলামন : এরপর 'লোক' শব্দটি অতিরিক্ত (সুপারফ্লুয়াস)। আমরা বলি 'ভুলো মন' বা 'ভুলো লোক'। এখানে 'অন্যমনস্ক' অর্থে নবতর বিশেষণের সৃষ্টি; বিচ্যুতির উদাহরণ। হতে পারে লৌকিক ভাষা থেকে গৃহীত।

কুঞ্চিতদলিত : ইংরেজি 'ক্রাশড্'-এর বঙ্গানুবাদ।

চিরাভ্যস্তবৎ : স্পর্ধার বিশেষণ। ইংরেজি 'হ্যাবিচুয়াল'-এর বঙ্গানুবাদ।

সজ্জিতসুন্দর : গঠন হল বিণ + বিণ। তৎসম সমাসের মোহ এড়াতে পারেননি।

লজ্জিতমুগ্ধ : ঐ

দীপহীন : আমরা 'নিষ্প্রদীপ', 'আলোকহীন', 'অন্ধকার' ব্যবহার করি। শব্দটি কবিসুষমাজাত।

কলরবক্ষুব্ধ : 'জনতা'র বিশেষণ। মহানগরীর ভয়ংকর কোলাহল এখানে লক্ষ্য।

নিরলসা : সম্পূর্ণ আভিধানিক প্রয়োগ। সংস্কৃত লিঙ্গা মানার ফল।

২. ধন্না, ঠাকুরণ, মেঠাই, (পানের) বাটা, বিবি, পোড়ারমুখী, মেমসাহেব, সরম, রোসো, লগ্নি, ডাইনী, ফেসাদ, গুমর, জিয়ন্ত, খোলসা, ছুতা, ব্যামো।

৩-৪. 'চোখের বালি'তে বক্তব্য আমাদের কাছে নূতন লাগে বলে এর বাক্যাংশের তৎসমবাহুল্য এবং নীরসতা চোখ এড়িয়ে যায়। সংলাপ অংশ যেমন প্রাণবান, বর্ণনা অংশে তেমনই জীর্ণ বাক্যাংশ আছে।

শুধু বক্তার উক্তির আগে তার মনোভাব, নাটকীয় কার্য সঞ্চার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের বাক্যাংশ প্রয়োগ করেছেন : 'রুদ্ধরোষে, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধীরভাবে, রক্তবর্ণ হইয়া, অসংযত ভাষায়, কাতর হইয়া, ধনুষ্টংকারের মতো বাজিয়া, সানুনয়স্বরে, হস্তদ্বারা তর্জন করিয়া, তীব্র কণ্ঠ,' বলা-কওয়া নানান ভাবের হয়। কিন্তু সংলাপ অংশের আগে বক্তার অঙ্গাভঙ্গি (জেশ্চার) স্বাভাবিক হলেও ধনুষ্টংকারের মতো বাজা কিংবা রক্তবর্ণ হয়ে ওঠার বর্ণনায় অকারণে সংস্কৃতঘেঁষা হওয়ার ঝোঁক আছে। এগুলির আদর্শ হলেন বঙ্কিম। অথচ রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে বাদ দিলেও সংলাপ রচনার ক্ষমতা রাখতেন, তার পরিচয় 'চোখের বালি'তে আছে।

(৫) অচল শব্দ/বাক্যাংশ :

৪-এর সূত্রে পাঁচ আসে। যেমন কুলায়, বিরলে, বিষদিগ্ধ। আবার তৎসমপ্রবণতা 'সুবাসিত-ফুরফুরে চাদর' কিংবা 'গুনগুন গুঞ্জরিত কাহিনী'র মতো বিষম বাক্যাংশ তৈরি করেছে।

৫.৩.৫ উপমার বিশেষত্ব ও শ্রীহীনতা

'চোখের বালি'তে বজ্র, বাণ ইত্যাদির সঙ্গে বারংবার উপমা দেওয়া হয়েছে। যেমন, 'বিদ্ধ মৃগীর মতো চকিত মৃত্যুবাণ বাজা', 'জলন্ত বজ্রের মতো কঠোর কটাক্ষ' 'মৃত্যুবাণাহত রক্তহীন পাংশু মুখ', 'বাণাহত জন্তুর মতো আর্তস্বরে কাঁদা', 'জ্বলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া'। এমনকি এক স্থলে ভীষ্মের শরশয্যার প্রসঙ্গও এসেছে : 'মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া ভীষ্ম যেরূপ স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, আশাও সেরূপ রাজলক্ষ্মীর কৃত সমস্ত প্রসাধন পরমধৈর্যে সর্বাঙ্গে গ্রহণ করিল' (৬০ পরি.)। বাণের তীক্ষ্ণতা, যন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা প্রতি ক্ষেত্রেই বাক্যের সঙ্গে তুলিত। গভীরে দেখলে পৌরাণিক জগতের অস্ত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ সার্থক উপমার অভাবে ব্যবহার করেছেন।

কখনও নারীর পাতিব্রত্য বোঝাতে প্রাচীন জগৎ এসেছে। যেমন, "শোকের তপ্ত তীর্থজলে অভিষিক্ত হইয়া এই তরুণী রমণী (আশা) প্রাচীন যুগের দেবদেবীদের ন্যায় একটি অচঞ্চল মর্যাদা লাভ করিয়াছে—সে এখন আর সামান্য নারী নহে, সে যেন দারুণ দুঃখে পুরাণবর্ণিতা সাধ্বীদের সমান বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে।"

স্পষ্টভাবে আশাকে পুরাণের সাধ্বীদের সঙ্গে তুলনা চরিত্রটিকে আদর্শের বাতাবরণ দিয়েছে।

(খ) "সেই প্রেমশূন্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কানের মধ্যে, বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে, তাহার সর্বাঙ্গে রক্তস্রোতের মধ্যে, তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীরবেষ্টিত নিভৃত

ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিরহশয্যাতলে একটি ভয়ানক গম্ভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বিসর্জনের বাদ্য বাজিতে লাগিল।" (৪২ পরি.)

এখানে আশার মনোযাতনা আরোহ-অবরোহক্রমে বর্ণিত হয়েছে। মনোভাব প্রথম তিনটি অংশে বহিরঙ্গে, তারপর অন্তরঙ্গে (রক্তস্রোতের মধ্যে), বিশাল প্রকৃতিতে, শেষপর্যন্ত আবার ছাদ, শোওয়ার ঘরে ফিরে এসেছে। যন্ত্রণার বহিঃরূপ আরোহীক্রমে প্রকৃতির উদারতায় অনুভূত, আবার তা বাস্তব পরিবেষ্টনে বিরহশয্যায় অপ্রেমের জ্বালা। 'বিসর্জনের বাদ্য'-এর সঙ্গে প্রেমহীন ব্যথাকে একাকার করার উপমা এখানে যেন বাস্তব হয়ে উঠেছে। এখানে তৎসম শব্দই প্রধান, 'বিসর্জনের বাদ্য' তৎসম হলেও বাঙালির পরিচিত বিশেষ উপমা।

(ঘ) "নদীর পরপারে অন্ধকারে সেই অভিসারিণী বহুদূরে—তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই, তাহার বয়স নাই, সে চিরন্তন গোপবালা—কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল—সে এই বিনোদিনী।" (৫১ পরি.)

মহেন্দ্রের এই অভিসারিকা-চিন্তা পদাবলির রাধিকাকে ঘরের বিনোদিনীর সঙ্গে অভিন্ন করছে। প্রেমিকের দৃষ্টি অপর যুগ থেকেও তার প্রেমিকার তুলনা খুঁজে পায়। বিনোদিনী এক্ষেত্রে এক লহমায় চির-অভিসারিকায় পরিবর্তিত। এখানে উপমা সন্দেহ অলংকারের রূপ নিয়েছে।

(ঙ) "বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চলভাবে সুপ্ত হইয়াছিল, যাহার কথা সে কখনো চিন্তাও করে নাই, বিনোদিনীর সোনার কাঠিতে সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্যোজাত গরুড়ের মতো সে আপন খোরাকের জন্য সমস্ত জগৎটাকে ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে।" (৪৮ পরি.)

দুটি উপমাগত বাক্য রবীন্দ্রভাষার একটি দ্বিধাগ্রস্ততা ফুটিয়েছে। 'সদ্যোজাত গরুড়ের ক্ষুধা' যেমন পৌরাণিক তুলনাটি মনে আনে, তেমনি 'সোনার কাঠি' শব্দে রূপকথার সংকেত বেজেছে। বিহারীর যৌবনানুভূতির এ এক আশ্চর্য সফল উপমা। কিন্তু 'খোরাক', 'ঘাঁটা' শব্দ দুটি পাঠককে উপমার ঐ স্তর থেকে মুহূর্তে সরিয়ে আনে। 'চোখের বালি'তে সাধু ভাষার শব্দজগতের সঙ্গে চলতি শব্দভাণ্ডারের 'বিষম মিলন' রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তায় দ্বিধার স্বাক্ষর।

(চ) এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব থেকে বাস্তবতা সঞ্চারের স্থূল চেষ্টা কতকগুলি অযথার্থ উপমার সৃষ্টি করেছে। যেমন,

চ$_১$ "গ্রীষ্মকালের ডোবার মাছ যেমন অল্পজল পাঁকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া খাবি খাইয়া থাকে, গলি-নিবাসী অল্পাশী পরিবারগ্রস্ত কেরানীর বঞ্চিত জীবন সেইরূপ।" (৪৮ পরি.)

চ$_২$ "অত্যন্ত বেদনার স্থানে দুই পা দিয়া মাড়াইয়া দিলে, আহত ব্যক্তি মুহূর্তকাল বিচার না করিয়া আঘাতকারীকে যেমন সবলে ধাক্কা দিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে—রুদ্ধকণ্ঠ বিহারী তেমনি।" (২৩ পরি.)

চ$_৩$ "সেই চিঠি যদি বিষধর সাপের মূর্তি ধরিয়া তখনই আশার অঙ্গুলি দংশন করিত তবে ভালো হইত; কারণ, উগ্র বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহার চরম ফল ফলিয়া শেষ হইতে পারে, কিন্তু বিষ মনে প্রবেশ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা আনে—মৃত্যু আনে না।" (৩৩ পরি.)

চ$_৪$ "বাছুর যেমন গাভীর স্তনে আঘাত করিয়া দুগ্ধ এবং বাৎসল্যের সঞ্চার করে, মহেন্দ্রের রাগ তেমনি রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়া তাহার অবরুদ্ধ বাৎসল্যকে উৎসারিত করিয়া দিল।" (৭ পরি.)

অযথার্থ উপমার আরও অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু এই চারটি উদাহরণ উপমার অস্বাভাবিকতা, স্থূলতা (ক্রুডিটি) বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। উপমা লেখকের প্রয়োজনীয় শিল্পকৌশল। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে বিষয়বস্তু সম্পর্কে যতটা সচেতন ছিলেন, প্রকাশের দিকে ততটা চেতনাবাদ ছিলেন না।

৫.৩.৬ ভাষার নাটকীয়তা, বাস্তবধর্মিতা, মনোবিশ্লেষণ প্রয়াস

১. এবং ২. পড়ে উপন্যাসটির ভাষাভঙ্গি সম্পর্কে বিশ্রব্ধ মনোভাব জাগতে পারে। কিন্তু এর ভাষায় কিছু সদাত্মক গুণও আছে। ঔপন্যাসিক যেমন বঙ্কিমের সংস্কৃত-প্রীতির অনুকরণ করেছেন, তেমনি তার নাটকীয়তাও। নবযুগের জীবনাবেগে দীপ্ত এই অংশগুলির নাটকীয়তা অন্তরঙ্গে বঙ্কিম থেকে স্বতন্ত্র পথচারী।

ক. ৩৫ পরিচ্ছেদে বিনোদিনী বলেছে : "ঠেকাইব কাহার জন্য। তোমার আশার জন্য? আমার নিজের সুখদুঃখ কিছুই নাই? তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই—ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব!"

বিনোদিনীর উক্তির স্পষ্টতার উত্তরে বিহারীর ব্যঙ্গ শাণিত : "তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে, এবং যে কথাগুলি বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই, তুমি যে সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে চুরি। ইহার বারো আনাই নাটক এবং নভেল।" (৩৫ পরি.)

বিহারীর শাণিত ব্যঙ্গে প্রাচীনপন্থী পাঠক খুশি হতে পারেন। অথচ বিহারী যে বিনোদের নবজীবনচেতনা, নারীর কামনাকে অস্বীকার করতে চায়, এটা দৃষ্টি এড়ায় না। বিনোদিনীর বাক্য তার অনুভবের দ্বারা প্রদীপ্ত, অন্যদিকে বিহারী প্রথামান্যের দ্বারা মলিন।

খ. কখনও 'চোখের বালি'র ভাষা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বাগ্‌ব্যবহারের আশ্রয় নিয়েছে। লক্ষ করার মতো নাটকীয় অংশে নাট্যসংলাপের মতো চরিত্রের নাম এবং বক্তব্য সাজানো :

মহেন্দ্র। তুমি আমাকে ভয় কর না কেন, এখানে তোমার রক্ষক কে আছে।

বিনোদিনী। তুমি আমার রক্ষক আছ। তোমার নিজের কাছ হইতে তুমি আমাকে রক্ষণ করিবে।

মহেন্দ্র। এইটুকু শ্রদ্ধা, এইটুকু বিশ্বাস, এখনো বাকি আছে!

বিনোদিনী। তা না হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিতাম, তোমার সঙ্গে বাহির হইতাম না। (৫১ পরি.)

রক্ষকের অভিনব ব্যাখ্যা, মহেন্দ্রের শুভবুদ্ধির কাছে বিনোদিনীর আবেদন, মহেন্দ্রের বিস্ময় সবকিছু রবীন্দ্রভাষার পরবর্তী ঔজ্জ্বল্যেরই পূর্বাভাস। এখানে কথা হচ্ছে দুজন শিক্ষিত মানুষে। আবেগের নাট্যরস অপেক্ষা বুদ্ধিগত আবেদন এই অংশটির বেশি।

গ. অন্নপূর্ণা প্রায়শ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভাষার কথা বলছে :

"ওরে বাছা, যাঁর সঙ্গে আসল দেনা-পাওনার সম্পর্ক, যিনি এই সংসার-হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমস্তই লইতেছিলেন, হৃদয়ে বসিয়া আজ সে-কথা স্বীকার করিয়াছেন। তখন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম বলিয়া

সংসারের কর্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হৃদয় দিতাম, তা হইলে কে আমাকে দুঃখ দিতে পারিত!" (৩০ পরি.)

তাই পরিচ্ছেদের প্রথমে অন্নপূর্ণা ভগবানকে 'স্বামী' বলে ঘোষণা করেছে। বৈধব্যজীবনে হিন্দু নারীর স্বাভাবিক ঈশ্বরধর্ম আঁকড়ে থাকা। অন্নপূর্ণা প্রথমে আশাকে স্বাভাবিকভাবে বুঝিয়েছে, দ্বিতীয়াংশে নাটকীয়তা নেই, তত্ত্বালোচনা আছে। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে তত্ত্ব যতই সত্য হোক, অন্নপূর্ণার মুখে তা বেমানান ঠেকে। এটি স্বাভাবিকতা এবং নাটকীয়তা ভেঙে তত্ত্বমুখিনতার প্রয়াস।

ঘ$_১$ 'চোখের বালি'তে নারীদের সংলাপে বাস্তবতার ছায়া গাঢ় হয়ে পড়েছে :

'তুই এমনি করিয়া আমার মাথা-হেঁট করিবি পোড়ারমুখী? লজ্জা নাই, শরম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, বৃদ্ধা শাশুড়ীর উপর সমস্ত ঘরকন্না চাপাইয়া তুমি এখানে আরাম করিতেছ? আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এই ঘরে আনিয়াছিলাম!" (৫ পরি.)

আশার প্রতি অন্নপূর্ণার এই উক্তি মেয়েলি 'রেজিস্টার'বহুল! 'গ'-তে যেমন পরিচ্ছেদের তত্ত্বসর্বস্বতা চরিত্রের স্বাভাবিক সংলাপ কেড়ে নিয়েছে, এখানে তেমনি স্বাভাবিকতার ছাপ আছে।

পাশাপাশি আশার কথাবার্তার স্বাভাবিকতার গণ্ডি ভাঙার চেষ্টা কম। যেমন,

ঘ$_২$ "মাথা খাও, একটি বার তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে। একবার যে করিয়া হোক তাহার গুমর ভাঙিতে চাই, তারপর তোমাদের যেমন ইচ্ছা তাই করিয়ো।" (১৩ পরি.)

ভাষার নাটকীয়তা, স্বাভাবিকতা ছাড়া কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। সাধারণভাবে উপন্যাসের বিবৃতি অংশ সাধু, সংলাপের ভাষা কথা। রবীন্দ্রনাথ দুটোকে সাধু করতে গিয়ে মাঝে মাঝে গুরুচণ্ডালি করেছেন। যেমন গ এবং ঘ$_২$। পাঠকমন সংলাপে কথ্যভাষা কল্পনা করে বলে পড়ার সময় এটি কানে বাজে না।

নাটকীয় সংলাপ যেমন উপন্যাসের বড়ো সম্পদ, তেমনি বাস্তবধর্মী বর্ণনাও পরিবেশরচনার পক্ষে জরুরি। রবীন্দ্রনাথ এই শর্ত কতদূর মিটিয়েছেন, তা, আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। বাস্তবধর্মী বলতে আলোকচিত্রবৎ প্রকৃতি নয়। রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতার কলম সবসময় মানসিকতাকে সঞ্চারিত করেছে। উপমার অপ্রখরতায়, তৎসম শব্দের অর্থহীন সম্ভার ক্লান্তিকর। কিন্তু মানুষের চোখে প্রকৃতিকে দেখার মধ্যে একটি নব-বাস্তবতা (নিওরিয়ালিজম) আছে। নিছক পরিবেশ প্রায় কোথাও নেই। অত্যুৎসাহী পাঠকের চোখে তা পড়লেও মাঝখানে চরিত্রটির উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

ক. "চন্দনগুঁড়া ও ধুনার গন্ধে ঘর আমোদিত...মশারিতে গোলাপী সেশমের ঝালর লাগানো, নিচের বিছানায় শুভ্র জাজিম তকতক করিতেছে এবং তাহার উপর...রেশম ও পশমের ফুলকাটা বিলাতি চৌকা বালিশ সুসজ্জিত।...সবসুদ্ধ ঘরের চেহারা অন্যরকম।" (২৬ পরি.)

আশার অন্তর্ধানে বিনোদিনীর এই নবসজ্জা সূক্ষ্মরুচির পরিচায়ক। এটি 'মহেন্দ্রকে ভুলাইবার কৌশল', শুধুমাত্র 'ঘরের চেহারা' পালটানো নয়। বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের অনুরাগ জাগানোর জন্য বাহ্য পরিবর্তনের দৃশ্য আপাতদৃষ্টিতে সামান্য হলেও মহেন্দ্রের চোখে পূর্ব-ইতিহাসের চিহ্ন লুপ্ত, নূতন হস্তের নবসজ্জায় একটি আচ্ছন্নতা সঞ্চারিত।

খ$_১$ "ঘর ফুলের গন্ধে পূর্ণ। উন্মুক্ত জানালা-দরজা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো শুভ্র বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী....মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরিয়াছে, গলায় পরিয়াছে কটিতে বাঁধিয়াছে—ফুলে ভূষিত হইয়া সে বসন্তকালের পুষ্পভারলুণ্ঠিত লতাটির ন্যায় জ্যোৎস্নায় বিছানার উপরে পড়িয়া আছে।" (৫১ পরি.)

ফুলের গন্ধে ভরা ঘর, ফুলসাজে সাজা যুবতী, জ্যোৎস্নায় ধোয়া ঘর সবই ছিল। দারুণ আবেগ-মোহময় দৃশ্য অভিনীত হবে, এমন পরিবেশ আঁকা হল। অথচ মহেন্দ্রের মোহভঙ্গের বেদনা ঘটবে বলেই এই আয়োজন। সে এই ফুলশয্যায় অনাহূত। মানুষের আশা আর আশাভঙ্গের অপূর্ব বৈপরীত্য আঁকাই খ১-এর গূঢ় অভিপ্রায়।

খ$_২$ যে জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, সুখাবহ চিন্তা মহেন্দ্রের মনে স্বপ্নের ঘোর এনেছিল, বিনোদিনীর প্রত্যাখ্যানে তার পরিবর্তন ঘটে :

"সেই কেয়ারি-করা বাগান, তাহার পরে বালুকাতীর, তাহার পরে নদীর কালো জল, তাহার পরে ওপারের অস্ফুটতা—সমস্তই যেন একখানা বড়ো সাদা কাগজের উপরে পেনসিলে আঁকা একটি চিত্র মাত্র—সমস্তই নীরস এবং নিরর্থক।" (ঐ)

মহেন্দ্রের ও বিনোদিনীর প্রকৃতি-দেখা মানসিক দিক থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি দুটি দর্শককে এভাবে সাজানো যায় :

মহেন্দ্রের চোখে প্রকৃতি	বিনোদিনীর চোখে প্রকৃতি
১. বাগানে ঘনপল্লব, বিপুল নিম্ববৃক্ষের পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা	১. কেয়ারি-করা বাগান
২. বালুকার অস্ফুট পাণ্ডুরতা	২. বালুকাতীর
৩. নিস্তরঙ্গ জলের মসীকৃষ্ম কালিমা	৩. নদীর কালো জল
৪. তরুহীন ম্লান ধূসর তটের বঙ্কিম রেখা	৪. ওপারের অস্ফুটতা

সারণি ১ : মহেন্দ্র ও বিনোদের চোখে প্রকৃতির দুই রূপ

৫১ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রের চোখে ঐ অভিসারিকা রাধার বর্ষাভিসারের প্রতিবেশ—যা যথেষ্ট বিশেষণে আঁকা। বিনোদিনীর চোখে একই প্রকৃতি নিরাভরণ, শুধু নদীর জলের বিশেষণ কালো। প্রথমটি যদি হয় তেলরঙে আঁকা ল্যান্ডস্কেপ, তাহলে অপরটি রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তিতে একটি পেনসিল স্কেচ, বর্ণহীন আঁচড়ের সমষ্টি মাত্র। দুটি নরনারীর মনোভাব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে দেখেছে।

গ. জ্যোৎস্নারাত্রি প্রকৃতি খ$_১$, খ$_২$ দৃষ্টান্তে দুটি নরনারীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিন্দু, আবার অমাবস্যার অন্ধকারও হৃদয়গুহার প্রকাশের কাজে রবীন্দ্রনাথ লাগিয়েছেন :

গ$_১$. "সেই পরমাসুন্দরী প্রহেলিকা তাহার দুর্ভেদ্যরহস্যপূর্ণ ঘনকৃষ্ম অনিমেষ দৃষ্টি লইয়া কৃষ্মপক্ষের অন্ধকারে বিহারীর সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীষ্মরাত্রির উচ্ছ্বসিত দক্ষিণ-বাতাস তারই ঘন নিঃশ্বাসের মতো বিহারীর গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল।" (৩৭ পরি.)

এরপর ১১ পঙ্‌ক্তি জুড়ে বিনোদিনীর আত্মনিবেদনের সুখস্মৃতি, অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বনের বেদনা বর্ণিত। রাত্রির অন্ধকার বিহারীর অন্তর থেকে অবচেতনকে তুলে ধরেছে। বিনোদিনীর জন্য কামনা অন্ধকার রাতে দুর্নিবার বলে আলোয় এসে বিহারী মহেন-আশার ফোটোগ্রাফ দেখছে। এ যেন মনের অবচেতনকে স্বপ্নে দেখে জাগ্রত অবস্থায় তাকে অস্বীকার করা।

গ. "বিহারীর ধ্যানে যখন সন্ধ্যার দীপশূন্য অন্ধকার ঘর যখন নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—যখন সমাজ-সংসার, গ্রামপল্লীর সমস্ত বিশ্বভুবন প্রলয়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে—তখন বিনোদিনী হঠাৎ দ্বারে আঘাত শুনিয়া....অসংশয় বিশ্বাসে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া কহিল "প্রভু আসিয়াছ?' তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল, এই মুহূর্তে জগতের আর কেহই তাহার ঘরে আসিতে পারে না।" (৩৮ পরি.)

এই অংশে নাটকীয়তা আছে। 'দীপশূন্য অন্ধকার ঘর' পরিপূর্ণ হয়ে আছে প্রেমিকের অনুধ্যানে। বিনোদিনীর প্রত্যাশা মেটেনি। বিহারীর বদলে মহেন্দ্র এসেছে। কিন্তু নির্জন রাত, অন্ধকার ঘর, প্রেমের চিন্তা বিনোদিনীর সামান্য ঘরকে মুহূর্তে অসামান্য করেছে। অন্ধকারের সুযোগে সে যাকে দুহাত বাড়িয়ে চায়, তাকে পায় না। আবার পূর্ব দৃষ্টান্তে বিহারী আঁধারের আড়ালে মনের দুর্বলতা দমন করার জন্য আলোকপিয়াসী হয়। দুটি উদাহরণেই অন্ধকারকে মানবহৃদয় উন্মোচনের প্রেক্ষাপটরূপে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন।

৫.৪ বঙ্কিমী দর্শনরীতি :

সব জায়গায় না থাকলেও মাঝে মাঝে পরিবেশবর্ণনা বঙ্কিমী আনুগত্য বজায় রেখেছে। যেমন,

ক. "তখন চৈত্রমাসের দিবসান্তে সূর্য অস্তোন্মুখ। দোতলার দক্ষিণ বারান্দায় চিত্রিত চিক্কণ চীনের টালি গাঁথা; তাহারই প্রান্তে দুই অভ্যাগতের জন্য রূপার রেকাবি ফলমূলমিষ্টান্নে শোভমান এবং বরফজলপূর্ণ রূপার গ্লাস শীতল শিশিরবিন্দুজালে মণ্ডিত। মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আলজ্জিতভাবে খাইতে বসিয়াছেন। নিচে বাগানে মালী তখন ঝারিতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল; সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণ বাতাস মহেন্দ্রের শুভ্র কুঞ্চিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশেপাশের দ্বার-জানালার ছিদ্রান্তরাল হইতে একটু-আধটু চাপা হাসি, ফিসফিস কথা, দুটা-একটা গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়।" (২ পরি.)

খ. "শরৎকালের প্রাতঃকাল অতি মধুর। রৌদ্র উঠিয়া শিশির মরিয়া গেছে, কিন্তু গাছপালা নির্মল আলোকে ঝলমল করিতেছে। প্রাচীরের গায়ে শেফালি গাছের সারি রহিয়াছে, তলদেশ ফুলে আচ্ছন্ন এবং গন্ধে আমোদিত।

আশা কলিকাতার ইষ্টকবন্ধন হইতে বাগানের মধ্যে ছাড়া পাইয়া বন্যমৃগীর মতো উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে লইয়া রাশীকৃত ফুল কুড়াইল। দুই সখীতে দীঘির জলে পড়িয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান করিল। এই দুই নারীতে মিলিয়া একটি নিরর্থক আনন্দে—গাছের ছায়া এবং শাখাচ্যুত আলোক, দিঘির জল এবং নিকুঞ্জের পুষ্পপল্লবকে সচেতন করিয়া তুলিল।" (১৭ পরি.)

ক, খ দুটি উদাহরণ একেবারেই পরিবেশরচনার জন্য। প্রথমটিতে পাত্রী দেখার বাঙালি পরিবেশ এবং খ-তে চড়িভাতিতে দুই নারীর উচ্ছলতা, পরিবেশের মনোরম ভাব বর্ণিত। এখানে পরিবেশের সঙ্গে হৃদয়ের

যোগাযোগ তেমন গভীর নয়। পরিবেশরচনার কুশলতায় বঙ্কিম চিরকাল জাত-শিল্পী। তাই এই দুটি অংশে তাঁর অনুসরণ স্বাভাবিক ছিল।

৫.৩.৭ এপিগ্রাম : ভাষার অন্ত প্রসঙ্গ

বাস্তবধর্মী বর্ণনাতে রবীন্দ্রনাথের মনোবিশ্লেষণ সঞ্চারের সার্থক প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করেছি। রবীন্দ্র-সুলভ এপিগ্রাম সংখ্যায় কম হলেও 'চোখের বালি'তে আছে। যেমন,

ক. "পরের জন্য হইলেও কন্যা দেখিবার প্রসঙ্গমাত্রেই যৌবনধর্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া লয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে।" (২ পরি.)

খ. "ভালোবাসার উৎসবও কেবলমাত্র দুটি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না—মুখালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য বাজে লোকেরও দরকার হয়।" (১১ পরি.)

গ. "কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে, ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী হয় না।" (৮ পরি.)

ভাষাবিচার করে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাধু গদ্যের বঙ্কিমী পর্বকে কিছুমাত্র ভাঙতে পারেননি। প্রচলিত ভাষাদর্শের রূপ মানতে গিয়ে বাক্য বা শব্দে বুদ্ধিদীপ্তির পরিমাণ তেমন ঘটেনি যা একটি আধুনিক, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস-ভাষা হতে পারে। ব্যক্তিকে নানা-ভাগ করে দেখার কঠিন চেষ্টা ভাষায় অসহজতার জন্য সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এখানে বিচ্যুতি যতটা দেখিয়েছেন, তার তুলনায় সংসক্তির পরিমাণ বেশি। পূর্বে লেখা 'কথা ও কাহিনী', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য'-এর সংস্কৃত উপমাজগৎ 'চোখের বালি'তে সক্রিয় ছিল। নূতন শব্দ গড়া, এপিগ্রাম অল্পস্বল্প এলেও তা বিশেষ ভাষাবৈচিত্র্য সাধন করেনি, বরং সেগুলির উজ্জ্বলতা ধূসর উপমার অন্ধকারে খানিকটা চাপা পড়েছে।

৫.৩.৮ 'চোখের বালি'র মূল্য, জনপ্রিয়তা, ঔপন্যাসিক কণ্ঠস্বর :

গঠনের দিক থেকে এই উপন্যাসটি বঙ্কিমের সাংগঠনিক ত্রিভুজের (স্ট্রাকচারাল পিরামিড)-এর সামান্য হেরফের ঘটিয়েছে। ঘটনার সংখ্যা কম নয়। বাইরের ঘটনা মনোজগতের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। ঘটনাহীন পরিচ্ছেদ নেই। আত্মবিশ্লেষণে চরিত্রগুলি মাঝে-মাঝে ঘটনা থেকে দূরে সরেছে। কিন্তু 'অন্তর্গূঢ় একোক্তি' (ইন্টার্নাল মনোলগ)[১১] ঘটনার দ্বারা পরিপুষ্ট। পরক্ষণেই নারীর ব্যক্তিত্ব, প্রেম, বিধবা-বিবাহের সমস্যা মহেন্দ্র-আশা-বিনোদিনী-বিহারীর বিশ্লেষণে পরিস্ফুট হলেও সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য (স্ট্রাকচারাল ইন্ডিপেন্ডেস) রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে পাননি। ভাষার ক্ষেত্রে সেভাবে অগ্রগতি নেই। অর্থাৎ উপন্যাসশৈলীর মৌল দুই ভিত্তি গঠন এবং ভাষা—'চোখের বালি'র ঔপন্যাসিক প্রতিষ্ঠা দেয়নি। রচনাটির অন্তরঙ্গে রূপে তাহলে কী আছে, যা সময়ের কলুষিত হাত এড়িয়ে এটিকে জনপ্রিয় কিংবা বিশেষ পাঠ্য করেছে?

এই প্রশ্নের সমাধানে আমাদের ইতিহাসপ্রেক্ষিত, সাহিত্যে আগের রচনার সঙ্গে এর সম্পর্ক ও অসম্পর্ক জানা প্রয়োজন। তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠা এই রচনার মূলে এটা বিস্মৃত হতে পারি না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-'অবলাবান্ধব' দ্বারকানাথ সকলেই নারীকে সামাজিক আসন দিতে চেয়েছিলেন। উনিশ

শতকের শেষ পর্বে তাই বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৮০), সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' (প্রথম অংশ ১৮৮০), দ্বি. সং. ১৮৯৬), দেবেন্দ্রনাথের অশোকগুচ্ছের 'নারীমঙ্গল' (১৯৯০) কাব্যে প্রতিষ্ঠা পায়। একদিকে সামাজিক আন্দোলন, অন্যদিকে গীতিকবিতার জগতে প্রবেশকারী নারীমহিমার মাঝখানে প্রাচীন পটে উজ্জ্বল আধুনিকতা সঞ্চারিত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। নারীর বিশেষ মূল্য বোঝাতে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ ব্যয়িত, দ্বিতীয় ভাগে অসংখ্যরূপে তার প্রকাশ সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে। কিন্তু নারীমহিমার স্বীকার উপন্যাসে নির্দ্বিধায় হয়নি। 'বিষবৃক্ষ'-এ নারীস্বাধীনতা যতটা, পরবর্তী পর্বে তা ততটাই কমে গেছে। নারীর মুক্তি নিয়ে বাঙালির বহির্চেতনা যতটা আন্দোলিত, অন্তরঙ্গে তার বিকাশ ঘটতে গোটা শতক লেগেছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বঙ্কিম-ভিন্ন বক্তব্য পোষণ করলেও ঔপন্যাসিক প্রতিভার অভাবে তা শিল্পিত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি'তে বিভার মতো আদর্শ নারীরূপ এঁকেছেন। কিন্তু বঙ্কিম-রমেশচন্দ্রের বিধবার প্রেম সমাধানের অসম সমাধানে তৃপ্ত হননি। তাঁর পরিবেশ-বিন্যাস ভিন্ন, প্রত্যক্ষ জমিদারি সংশ্রব এড়ানোর চেষ্টা করেছেন। বিহারীর জমিদারির বিবরণ সামান্যভাবে এক জায়গায় আছে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ ব্যাখ্যাত নয়। মহেন্দ্র অবশ্য এফ.এ. পাস করে ডাক্তারি পড়ে, বিহারী নবযুগমাফিক এনজিনিয়ারিং ছেড়ে মেডিকেল কলেজে ঢোকে। লক্ষ করার মতো, শহরবাসী এই দুই যুবকের চাকরির বা অর্থের কোনো প্রয়োজন হয়নি। তাই সমস্যাটি শহর কলকাতার বহির্জগৎ থেকে বাড়ির চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ।

১৮৯০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত বারবার ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ, প্লেগের মহামারি; ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ; মুসলমানদের হিন্দুবিদ্বেষ—এসকল শাহরিক ঘটনা মহেন্দ্র-বিহারীর চিত্তে আলোড়ন জাগায়নি। শুধু বিহারী রুগ্‌ণ কেরানীর জন্য আশ্রম স্থাপন করে সামাজিক কর্তব্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসজগতে সামাজিক-ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণ এসেছে পরে। সব মিলিয়ে আর্থিক নিরাপত্তা মহেন্দ্র-বিহারীকে নিশ্চিন্তে হৃদয় খুঁড়বার প্রেরণা দিয়েছে। উনিশ শতকে এই মুষ্টিমেয় ধনবান, উচ্চশিক্ষিত যুবকদের জীবনে একটি নবযুবতী বিধবার প্রেমকামনা অশান্তির সৃষ্টি করল। বিনোদিনী উচ্চবিত্ত সমাজের নয়। কিন্তু সে সেখানে স্থান পেয়েছে। দরিদ্র অসহায়ার ধনীর ঘরে আশ্রয়লাভ উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে সাধারণ ঘটনা। কুন্দের আশ্রয়লাভও এই জাতীয় ব্যাপার। তবে আশ্রিতকে সর্বগুণময়ী করে দেখানো এযাবৎ হয়নি। বিনোদের মানবিক-জৈব আকাঙ্ক্ষা তীব্র অথচ স্বাভাবিক। মহেন্দ্রের মতো অসংযমীর সামনে রাজলক্ষ্মী যেভাবে বিনোদিনীকে আশার প্রতিপক্ষ করে তুলেছেন, তাতে সংসারে ফাটল ধরেছে। বিনোদিনীর জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা তিলে তিলে বেড়েছে। আধুনিক পাঠক-সমালোচকের কাছে এর জনপ্রিয়তা বিনোদিনীর চরিত্রক্রমেজাত বক্তব্যগুণে। বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথের পশ্চাদপসারণ এখানেই শুরু। মনস্তাত্ত্বিক কুশলতা সঞ্চারিত তাই ঐ প্রেমের বিচিত্র বিকাশে।

রবীন্দ্রনাথ কুন্দ-রোহিণীর পরিস্থিতি পছন্দ করেননি। একজন 'সবলা' নায়িকাকে এনেছেন যার ব্যক্তিত্ব আছে, অবহেলায় পুরুষকে জয় করতে পারে। তার অতৃপ্ত সংসারকামনা, দারিদ্র্য মহেন্দ্রের সংসারে প্রতিষ্ঠালাভের স্বপ্ন দেখিয়েছে। মহেন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণ যতটা প্রতিষ্ঠাবাসনায়, ততটা আন্তরিক নয়। একটি সাজানো সংসারে কর্ত্রী হওয়ার বাসনা তার জেগেছিল। আশা ছিল তার 'খেলার পুতুল'। রাজলক্ষ্মীর চোখে বিনোদের বাসনাটি সুন্দর ধরা পড়েছে : 'তুমি যে কেমন মায়াবিনী, তাহা আমি জানিতাম না।' এরই

মধ্যে সর্বনাশ ঘটেছে। মহেন্দ্রের সংসার জ্বালানোর পর তার সংবিৎ জেগেছে। অসামান্য ব্যক্তিত্বময়ীর উপযুক্ত পাত্র মহেন্দ্র ছিল না, প্রেমের ঘটকে পূর্ণ করার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। ধনী, মাতৃলালিত, ব্যক্তিত্বহীন, সংসার-অনভিজ্ঞ মহেন্দ্রের সম্পূরক চরিত্র বিহারীর কাছে বিনোদিনী শূন্য মুঠো পূর্ণ করতে গেছে ভালোবাসার দানে। বিহারী রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র। সে প্রথমাবস্থায় বিনোদিনীর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেছে। বিহারী আদর্শ মানব, কর্মিষ্ঠ; সহজে প্রেমের ডাকে সাড়া দেয়নি। বিহারীর প্রত্যাখ্যান বিনোদকে আরও উত্তেজিত করেছে। যদিও অন্তরের গভীরে তার স্থান আরও দৃঢ় হয়েছে।

তার পশ্চিমযাত্রা আসলে ক্ষুব্ধ চিত্তেরই অশান্ত যাত্রা। হাতের কাছে পাওয়া পুরুষের সামান্যতা আর অপ্রাপণীয় পুরুষের জন্য তার বিরহ বাংলা উপন্যাসভূমিতে একেবারেই নূতন। ৫১ পরিচ্ছেদে বিনোদিনীর অনুভবটুকু এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় : "কেন একটা অনাবশ্যক ভালোবাসার প্রবল অভিঘাত প্রত্যহ তার ধ্যানের মধ্যে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতেছে। আর একটা আগন্তুক রোদন বারংবার আসিয়া তাহার অন্তরের রোদনকে বেশ পরিপূর্ণ অবকাশ দিতেছে না। এই যে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনকে সে জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহাকে লইয়া সমস্ত জীবন সে কী করিবে।"

এই প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্ব সেভাবে আগে নায়িকাকে আলোড়িত করেনি। সাধারণ জৈবিক কামনা থাকলে মহেন্দ্রের রক্ষিতা হয়ে তার সময় মন্দ কাটত না। বিনোদিনী আধুনিকা, শিক্ষিতা নারী। সামান্যতে খুশি হবার মানসিকতা তার ছিল না। তাই মহেন্দ্রের বিকারগ্রস্ত ভোগকামনা তাকে ক্লান্ত করে। অন্তরের গভীরে ভালোবাসার মানুষের জন্য সে অপেক্ষা করে। সাংসারিক বঞ্চনার জ্বালা ধীরে ধীরে কমে এসেছে। পাপের বিচিত্র গতি দেখেও সে ক্লান্ত। 'হৃদয় রক্তে ভেসে যায়', কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় না কিছুতেই। জীবনের রস পান করতে উন্মুখ চিত্ত শান্ত হয়ে আসে। মহেন্দ্রের মোহভঙ্গ ঘটে। জীবনকে আঁকড়ে ধরার জন্য বিধবার মনোভূমি এ পর্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষিত, একটি মনের আলোকে বাকি কটি চরিত্রকেও পাঠক চিনতে পারেন। বঙ্কিমী বক্তব্যকে অস্বীকার করার দৃঢ়তা, মনস্তত্ত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে। 'চোখের বালি' ১৮৬৫ থেকে ১৯০৩-এর উপন্যাসজগতে অসামান্য আখ্যা পায়।

যে বুর্জোয়া উদার মানবিকতা বিনোদিনীর চাওয়া-পাওয়ার কাহিনি বুঝতে আগ্রহী ছিল, পরিণামে তাকেও দ্বিধাজড়িত হতে হয়েছে।[১২] বঙ্কিমের নায়িকারা প্রেমের শেষ পর্বে উন্মাদিনী (শৈবালিনী), আত্মহত্যাকারী (কুন্দ) কিংবা নিহত (রোহিণী)। রবীন্দ্রনাথ ততটা নিষ্ঠুর নয়। বিনোদিনীর পরিণতি এর চেয়ে মার্জিত, সুন্দর। বিহারীর বিয়ের প্রস্তাব ফেরানো, বিহারীর ধ্যানের মূর্তিকে অন্তরে রেখে কাশীযাত্রা একটি অস্বাভাবিক সমাধান-কল্পনা। যে ব্রাহ্ম-হিন্দু সমাজের কথাকে ভুলে তিনি শিল্পীর মনকে প্রকাশ করেছিলেন, শেষ পর্বে (৫২-৫৫ পরিচ্ছেদ) তা সাহসীক সমাধানকে বাধা দিল। লেখক সমাজের প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে চাননি। এখানে রোমান্সের আলো জ্বলে উঠল সেই কারণে। 'শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ' হয় বিশ শতকের প্রথম দশকে, এটা তিনি জানতেন। কিন্তু সামাজিক রবীন্দ্রনাথের হাতে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পরাজয় আমাদের ব্যথিত করে। যে বিদ্রোহভাবনা একটি নারীর মর্মজ্বালাকে একান্নটি পরিচ্ছেদের দীর্ঘ বিস্তারে বর্ণনা করল, তা সামাজিক কারণে প্রশমিত হল। উপন্যাসটির এই অপূর্ব সমাপ্তিতে হিন্দুসমাজের বর্ষীয়ানরা নিশ্চয়ই স্বস্তি পেয়েছিলেন। আবার ব্রাহ্ম-ভিক্টোরীয় শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষের কাছেও তা সমানভাবে গ্রহণীয়। 'মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শ'

উপন্যাসে এল বটে, কিন্তু সামাজিক ধারণার চাপ তাকে পুরোপুরি বিনষ্ট করল। 'আঁতের কথা' শেষ হল না, সমাজ তার নিষেধের তর্জনী তুলল উপসংহারে। দার্শনিক বাস্তবতাবাদ গোড়া থেকে বহমান থেকেও শেষরক্ষা করতে পারল না 'সোস্যাল কনস্ট্রেন্টস'-এর চাপে। আমরা সানন্দে 'চোখের বালি'র ভূমিকা পড়ে, মনোজগৎ বিশ্লেষণের প্রতিভায় মুগ্ধ হলেও অতৃপ্ত থাকি। ব্যক্তিমানস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের যে উজ্জ্বল রূপায়ণ করতে চেয়েছিল, তা সার্থকতা পেল না। বিপরীতে একান্নটি পরিচ্ছেদে বদ্ধ থাকলেও উপন্যাস-দেহটিতে বহিরঙ্গ চমক দেখি না। অন্তরে কিন্তু কষ্ট পেতে থাকি, নূতন অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হই। গঠন-ভাষাদীপে হৃদয়ে 'বহুদীপের জ্বলন' ঘটেনি। বক্তব্যের নবীনতা, প্রথাবিরোধী সংস্কারহীন প্রেমের বলিষ্ঠ প্রকাশ, অসাধারণ দীপ্ত নারীচরিত্রের 'মনের সংসার'-বিবরণী 'চোখের বালি'কে অসামান্য করেছে। যে নারীমুক্তির বাণী রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস-ছোটোগল্পকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, তার ঔপন্যাসিক রূপের প্রথম পরিচয় 'চোখের বালি'। শৈলী-বিজ্ঞানে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্ব খোঁজার আগ্রহ আমাদের এই শেষ স্তরে নিয়ে এল, যেখানে শিল্পীব্যক্তিত্ব ভাষা-গঠনে বঙ্কিমীপথের পথিক হলেও কণ্ঠস্বরে, মনের সুলুকসন্ধানে নবযুগ আনলেন।

উল্লেখসূচি

১. সহজ অপসারণ কৌশলে ঔপন্যাসিক চরিত্রের নিরুদ্দেশ যাত্রা, স্বাভাবিক/অস্বাভাবিক, বয়সোচিত/অকাল মৃত্যুর পথ বেছে নেন। অপসারণযোগ্য চরিত্রটি কাহিনীর প্রয়োজন ফুরোলে নির্মমভাবে বাদ পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে নীতি-শিল্পের দ্বন্দ্ব এই অপসারণের হেতু হয়ে দাঁড়ায় (রোহিণীর হত্যা/কৃষ্ণকান্তের উইল)।

২. রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৮৬) 'সংসার'।

৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৫) 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (৫ম সং, পৃ. ১৪)।

৪. Edel, Leon (1965) *The Psychological Novel, Rupert Hart Devis, London.*

৫. Watt, Ian (1957) *The Rise of the Novel,* 'Realism & the Novel Form', Penguin Books in association with Chatto & Windus, London.

৬. Ibid, Ch. 3, p. 66.

৭. 'Inter-Sentence Grammar'-এ বাক্যের আলোচনায় বাক্য-বহির্ভূত প্রসঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য আসে।

৮. ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৮১) 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড), পৃ. ১৭৮।

৯. ফকীরমোহন সেনাপতি, (১৯০২) 'ছ মণ আঠ গুণ্ঠ', বাংলা অনুবাদ 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' (১৯৬৫) 'চোখের বালি'র সমকালে প্রকাশিত ওড়িয়া উপন্যাসের সূচনা করেছে। এখানে উপন্যাসগঠন ভিন্ন। বঙ্কিমভিন্ন মডেল যে ভারতীয় উপন্যাসে ছিল, তারই পরিচয়।

১০. এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় উৎসাহীরা ড. ক্ষেত্র গুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি' দেখতে পারেন।

১১. এ প্রসঙ্গে সুন্দর তত্ত্বগত বিশ্লেষণ আছে ড. পবিত্র সরকারের 'বাংলা গদ্য : রীতিগত অনুধাবন' প্রবন্ধে। এটি সমতট প্রকাশনীর 'বাঙলা গদ্য শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৮০) গ্রন্থে সংকলিত।

১২. এই দৃষ্টি-পরিবর্তন (Shift of Vision) পার্সি লাবক এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : 'There is nothing more disconcerting in a novel than to see the writer changing his part in this way throwing off the character into which he has been projecting himself and taking a new stand outside and away from the story.' (*The Craft of Fiction :* First Indian Edition, 1979, p. 87).

লাবক এরপরে দৃষ্টি পরিবর্তনের অশুভ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন :

'here is a new view of it, external and detached, and another mind at work, the author's—and that sense of having shared the life of person in the story seems suddenly unreal.' (Ibid, p. 88).

উৎসগ্রন্থ ও প্রবন্ধ

বাংলা

১-৮. আশিসকুমার দে (১৯৮২), যোগাযোগ : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বর্ষ ১৮ : সংখ্যা ১।

(১৯৮২), উপন্যাস-শৈলী ও চোখের বালি, প্রমা, বর্ষ ৪ : সংখ্যা ৩।

(১৯৮৩), রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বর্ষ ১৯ : সংখ্যা ১।

(১৯৮৩), ফকীরমোহনের 'ছ মণ আঠ গুণ্ঠ' : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, জিজ্ঞাসা পত্রিকা, বর্ষ ৩ : সংখ্যা ১।

(১৯৮৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননী : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বর্ষ ১৯ : সংখ্যা ২।

(১৯৮৩), উপন্যাসের শৈলী : তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যাপিরাস।

(১৯৮৪), তিনজনা সেই ছিন্নমূলে : চতুরঙ্গ, জিজ্ঞাসা, বর্ষ ৪ : সংখ্যা ১।

(১৯৮৫), তারাশঙ্করের গণদেবতা : শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বর্ষ ২০ : সংখ্যা ৪।

(১৯৮৭), রবীন্দ্র-উপন্যাসে উপসংহার : কাম্যতা ও সম্ভাব্যতা, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রসংখ্যা (৫-৬ সং), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৯. ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৮৬), বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়।

১০. পবিত্র সরকার (১৯৮৫), উপন্যাসের ভাষা-শিল্প ও শরৎচন্দ্র, গদ্যরীতি-পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক।

১১. হীরেন চট্টোপাধ্যায় (১৯৮২), বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

ইংরেজি :

১. লাবক, পার্সি (১৯৫৪), দা ক্রাফট অব্ ফিকশান, জোনাথান ক্যাপ, লন্ডন।
২. মুইর, এডুইন (১৯২৮), দা স্ট্রাকচার অব দা নভেল (প্রথম ভারতীয় সংস্করণ), বি. আই. পাব্লিকেশনস, নয়াদিল্লি।

অনুশীলনী :

১. স্টাইলের বাংলা পরিভাষা রীতি না শৈলী কী হবে, তা আলোচনা করো।
২. রাশিয়ান ফর্মালিজম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।
৩. অবয়ব পদ : প্রথম গোষ্ঠীর মূল বক্তব্য কী ছিল, তা লেখো।
৪. শৈলী বিজ্ঞানের নানা মহল বলতে কী বোঝায়?
৫. উপলক্ষের মানক সম্পর্কে লেখো।
৬. 'আমাদের মতামতে' সাহিত্যশৈলী আলোচনার কোন্ পথকে বেছে নেওয়া হয়েছে?
৭. কবিতার শৈলী কীভাবে বিচার করা যায়, তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।
৮. গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব কতটা কবিতার আলোচনায় গ্রহণ করা যায়, তা বিচার করো।
৯. প্রমুখণ (মণ্ডল) কীভাবে সংঘটিত হয়?
১০. শব্দের দুরূহতা কীভাবে কবিতাপাঠে বাধা তৈরি করে, তা বুঝিয়ে দাও।
১১. যুক্তির গদ্য ও সৃষ্টির গদ্যের বিভাগকে কতদূর মানা যায়, তা আলোচনা করো।
১২. ভাষাদর্শ (নর্ম) ও বিচ্যুতি (ডেভিয়েশন) কেন এবং কীভাবে ঘটে, উল্লেখসহ বুঝিয়ে দাও।
১৩. গদ্যের শৈলীবিচারে যেসব মানদণ্ড (মানক) উল্লিখিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে লেখো।
১৪. ক্রিস্টাল ও ডেভির অনুসরণে শৈলীর আটটি মানকের পরিচয় দাও।
১৫. ছোটোগল্পের শৈলীবিচারের চারটি সূত্র সংক্ষেপে লেখো।
১৬. ছোটোগল্পের শৈলী বলতে কী বোঝায়?
১৭. উপন্যাসের বর্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখাও।
১৮. প্রসঙ্গ ও সমস্যাতত্ত্ব কীভাবে উপন্যাসে গৃহীত হয়?
১৯. উপন্যাসের অবয়ব (স্ট্রাকচার) প্রচলিত সমালোচনায় কীভাবে আলোচিত হয়?
২০. উপন্যাসের ভাষা আলোচনা উপন্যাসের বিচারে কতটা প্রয়োজনীয়, তা সংক্ষেপে লেখো।
২১. উপন্যাসের শৈলী বিচারের কারণ কী?